# MAHA PRASTHAN.

A
ROMANCE.

BY

PRAKAS NATH MALLIK.

# মহাপ্রস্থান।

শ্রীপ্রকাশনাথ মল্লিক

প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED BY PRIYA NATH MALLIK

AT THE

SUBURBAN PRESS, BHOWANIPORE.

1877.

# উপহার।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

দাদা!

মনে করিয়াছিলাম, আমার প্রথমলিখিত এই পুস্তকখানি স্বর্গীয় পিতা ৺ কেদারনাথ মল্লিকের শ্রীচরণে উপহার দিব। পিতা অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, এখন আপনিই আমার পিতৃস্থানীয়। আপনার হস্তে পুস্তকখানি সমর্পণ করিলাম; পাঠ করিয়া আপনি সন্তোষ লাভ করিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ভবানীপুর
১২ই ফাল্গুন। ১২৮৩

প্রণত
শ্রীপ্রকাশ নাথ মল্লিক।

# মহাপ্রস্থান।

## উপক্রমণিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেয়, উপাধি দেয়, কিন্তু চিরকালের মত মনের সুখ ও শান্তি হরণ করে। আমি কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে এগার বৎসর পাঠ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইলাম, অধ্যক্ষেরা বিদ্যা হইয়াছে বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন; কিন্তু বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতে মনে যে অসুখাগ্নি জ্বলিয়া ছিল, আমাকে অনেককাল তাহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। অতি অল্পদিন হইল, সেই বিষম বহ্নি উপশম হইয়াছে।

কেবল আমি বলিয়া নয়, আমার সহাধ্যায়ীদিগের অনেকেই অশেষ ক্লেশ সহিয়াছেন। কেহ কেহ আজিও মনের শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

অধ্যয়নাবস্থায় আমি বিবাহকে দাসত্ববন্ধন বলিয়া মনে করিতাম। যাহারা বিবাহের প্রলোভনে ভুলিয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে, আমি তাহাদিগকে কাচমূল্যে চিন্তামণিরত্ন-বিক্রয়াপরাধে দোষী মনে করিতাম। এই সময়ে বাল্মীকি তাঁহার পতিপ্রাণা তনয়া সীতা, শ্রীহর্ষ রত্নাবলী, বাণভট্ট মহাশ্বেতা ও কালিদাস তাঁহার তাপস-মন-বিমোহিনী পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া একে একে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দুই চারি জন কন্যাভারগ্রস্ত ইউরোপীয় মহাপুরুষও তাঁহাদের বিশ্বরঞ্জিনী কন্যাগুলিকে আনিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন। আমার অবিবাহিত সহাধ্যায়িগণ তাহাদের মধ্যে দুই একটি করিয়া কন্যা বাছিয়া লইলেন; মনে মনে তাহাদের রূপগুণ বিবেচনায় ব্যাপৃত হইলেন; কবে বিবাহ হইবে, কবে সজীব শকুন্তলা ও ডেসডেমোনা তাঁহাদের সহচরী হইবেন, সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। ক্ষোভের বিষয় এই, তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল

না ; তাঁহারা যেরূপ স্ত্রীলাভ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের মন উঠিল না। তখন নিরুপায় দেখিয়া সংসার কেবল দুঃখময় বলিয়া বুঝিলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সংসারসাগরে অবগাহন করিলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছিলেন, ঐ সকল অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের মনে বিষম বিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, পৃথিবীতে তাঁহাদের মত দুঃখী আর কেহ নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী। আমি এখন দেখিতেছি, আমার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে অনেকেই এই সকল কারণে নিতান্ত অসুখী।

বিবাহসম্বন্ধে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত আমার সর্ব্বদাই তর্ক বিতর্ক হইত। হরমোহন ভট্টাচার্য্য একদিন বলিলেন "দেখ বিবাহের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য—সংসারে একজন সুখ, দুঃখ, সকল সময়ের সহায়লাভ। এইরূপ একজন সহায় না থাকিলে সংসার শূন্য বলিয়া বোধ হয়।"

আমি। ভীরু ও দুর্ব্বল প্রকৃতি লোকদিগেরই এরূপ সহায়ের প্রয়োজন; আরও যে সময়ে লোকে বিবাহ করে, তখন এতদূর জ্ঞান জন্মে না। বল—বংশরক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হর। তাহাই বা নয় কেন? পুত্ত্রোৎপাদন ব্যতিরেকে সংসার থাকিতে পারে না।

আমি। সকলেরই সে চেষ্টা কেন? সকলেরই এ দাসত্ব কেন?

হর। তুমি ব্যক্তিবিশেষের উপর পুত্ত্রোৎপাদনের ভার দিতে চাও না কি?

আমি। আমার তাই মত। আমি বলি, যাহারা দুর্ব্বলপ্রকৃতি বা নির্ব্বোধ, কোন মহৎকার্য্য যাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, তাহাদের উপরই এ কার্য্যের ভার থাকুক। শ্রমজীবীদিগের ন্যায় পুত্ত্রোৎপাদক বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হউক।

হর। পিতার গুণ পুত্ত্রে আইসে। তোমার মতে কাজ হইলে পৃথিবীতে আর বুদ্ধিমান লোক জন্মিবে না।

হরমোহন তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ অনেকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন,

আমিও তাঁহার মত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য অনেকগুলি উদাহরণ উপস্থিত করিলাম ; সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

ইহার অল্পদিন পরেই পিতা আমার দর্প চূর্ণ করিলেন। শ্রীরামপুরের কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। আমি নিতান্ত বিরক্ত হইলাম। ইহার পর যত দিন যাইতে লাগিল, ক্রমেই এই বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। শেষে সংকল্প করিলাম, জন্মাবচ্ছিন্নে কখন স্ত্রীর মুখ দেখিব না।

বিবাহের প্রায় চারি বৎসর পরে আমার পাঠ সমাপন হইল। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে আমি একদিনও পত্নীর সহিত বাক্যালাপ করি নাই। দিবারাত্রি অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়া মন কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত রাখিতাম। এখন আর বাটীতে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। চিরকালের জন্য গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমাদের বাটী যশোহরের নিকট পল্লীগ্রামে। পিতা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন। পরীক্ষার অবসানে তিনি আমার পত্নীকে বাটী হইতে আনাইলেন। আমিও এই সময়ে পশ্চিমে যাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিলাম। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তিনি শেষে ক্ষুব্ধহৃদয়ে সম্মতি দিলেন।

লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী অতি সাধুস্বভাব। আমার শ্বশুর চিরকাল পশ্চিমাঞ্চলে চাকরি করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন, আপনার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাকে কখন স্থানান্তরে রাখেন নাই। প্রত্যুত অতি যত্নের সহিত তাহাকে নানাবিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। আমার পরীক্ষার পাঁচ মাস মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পশ্চিম যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে রাত্রিতে আমি পাঠগৃহে বসিয়া আছি, যোগমায়া গৃহে আসিল। এই তাহার প্রথম আমার গৃহে আগমন। আমি দারুণ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমার ভাব দেখিয়া যোগমায়া বলিল "আপ-নাকে বিরক্ত করা আমার অভীষ্ট নয়। কেবল গুরুজনের আদেশেই গৃহে আসিয়াছি।"

তাহার মুখ দেখিয়া আমার একটু ক্ষোভ হইল ; বলিলাম "যোগ, বাহিরে যাও, তোমার জন্য আমি চিরদুঃখী।"

যোগ। আমি মরিলে আপনি সুখী হন।

আমি। না—আমি তোমার মরণ চাহি না। আমি চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হইব ; সন্ন্যাসী হইয়া জীবন কাটাইব।

যোগ। আপনি কেন সন্ন্যাসী হইবেন ?—

আমি। আমি তোমাকে ভাল বাসিতে পারিব না ; সুতরাং গৃহে থাকিলে তোমার আমার উভয়েরই অসুখ—

যোগ। আপনি গৃহে থাকুন—তাহা হইলেই আমি সুখী হইব—

আমি। তুমি সুখী হইবে, আমি সুখী হইব না। আমি নিজ-সুখাশী। কিন্তু আমার সংকল্পের কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে, আমি নিশ্চয় মরিব। যাও—বাহিরে যাও।

যোগ। অল্পকাল আপনাকে দেখিয়া লই।

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আসন হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম; আসিতে আসিতে যোগমায়ার শেষ কথা শুনিলাম;—যোগমায়া বলিল "নিষ্ঠুর, তুমি যেখানে সুখী হও, যাও; কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার কেহই নাই, বুঝিলে না।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলাম। আমার সংকল্পের কথা যোগমায়া ভিন্ন কেহই জানিল না।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

১২৭৯ সালের ১৬ই বৈশাখ আমি কাশীতে আসিলাম। পিতা কাশীর অনেকের নিকট পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন ; আমি কোথাও না গিয়া যাত্রা-ওয়ালাদিগের আশ্রয় লইলাম। তাহাদের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে দেব-দর্শনে বাহির হইয়া দুই প্রহরের পর ফিরিয়া আসিতাম। সায়ংকাল গঙ্গাতীরে অতিবাহিত হইত।

এইরূপে ১৫ দিন অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে কাশীস্থ অনেক পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বার্থের দাস; সুতরাং কাহারও অনুরোধে পড়িয়া আমাকে যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হয় নাই।

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া রামনগরের গঙ্গামূর্ত্তির প্রশংসা শুনিলাম; দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে নৌকারোহণে রামনগর যাত্রা করিলাম। ঘাটে উঠিয়াই সম্মুখে গঙ্গার মকরবাহনা অপূর্ব্ব প্রশান্ত মূর্ত্তি। এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই। দেখিলে ভক্তির উদয় হয়।

গঙ্গার মন্দিরের উত্তরে উপরে ব্যাসের মন্দির। স্থানটি প্রশান্ত ও রমণীয়। আমি মন্দিরের দালানে সুখাসীন হইলাম। জগৎপ্রথিত পুরাণের কথাগুলি একে একে মনে আসিতে লাগিল। যে সময়ে দেশে দেশে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া, হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল, বিন্ধ্যাচল হইতে মলয়গিরি পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া, গান্ধার হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, নগনদী, প্রান্তর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দৃঢ়ব্রত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সংগ্রহ করেন, যেন সেই সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে সময়ে হিমালয়প্রস্থে বদরীমূলে বসিয়া ব্যাস মহাভারত গান করিতেন, যখন কলবাহিনী নগনদীতীরে পাষাণ খণ্ডে বসিয়া—চঞ্চল জলে চাঁদ ভাসিয়া যায়, বৃক্ষশাখাগুলি তাহাকে ধরিতে যাইতেছে, চাঁদ ভাসিয়া গেল, শাখাগুলি বিফলপ্রয়াস হইয়া ফিরিল, আবার নূতন চাঁদ ভাসিয়া যায়, আবার ধরিতে চলিল, আবার ফিরিল—এই সকল প্রকৃতির খেলা দেখিতেন; যখন নিশীথে কুশাশয়নে নিমীলিতচক্ষে বেদান্তচিন্তায় নিশা অতিপাতিত করিতেন, সেই সময়ে যেন দেখিতে পাইলাম; যখন হস্তিনার রাজসভায় বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণয়নে ব্যাপৃত হইতেন, সত্যের সম্মানার্থ রাজকার্য্যে নিবিষ্ট হইতেন, লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানময় ইতিহাস পুরাণ শুনাইতেন, মানস-চক্ষে সেই সময় দেখিতে পাইলাম। আবার যখন শিবের সহিত বিবাদ করিয়া সাতদিন, সাতরাত্রি অনাহারে কাশীর লোকের দ্বারে দ্বারে—ব্যাসের সেই দুর্দ্দশা মনে হইল—কাশীর দিকে চাহিলাম—সেই কাশী, সেই গঙ্গা, সেই

শিব—সেই জন্য, সেই অপমান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আজ এখানে ব্যাসদেবের মূর্ত্তি! এই মনুষ্যের মহত্ব!

অনেক ক্ষণের পর একজন পাণ্ডা আসিয়া আমার সুখময় দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করিল। তাহার মুখে শুনিলাম, রামনগরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে দক্ষিণ দেশের এক রাজা আসিয়া বাস করিয়াছেন। তিনি সংসারত্যাগী। ছয় বৎসর হইল তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া কাশীবাস করেন। কাশীতে ঈশ্বরোপাসনার অনেক ব্যাঘাত দেখিয়া নির্জ্জন স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সংসার বিরাগী রাজাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। আমি রামনগর ত্যাগ করিয়া নৌকারোহণে দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় রাজর্ষির আশ্রম প্রান্তে নৌকা লাগিল।

গঙ্গার সহিত একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম স্থলে ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডে সুধাধবল প্রাচীরবেষ্টিত আশ্রম। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একপার্শ্বে চারি পাঁচটি গৃহ। তাহার মধ্যস্থলের দুইটি গৃহে শিবলিঙ্গ ও রামসীতা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আর কয়েকটিতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাস করেন। অপর পার্শ্বে পাকশালা ও পরিচারকদিগের স্থান। তৃতীয় পার্শ্বে সুন্দর সুপরিপাটী পুষ্পোদ্যান। পুষ্পবৃক্ষগুলি প্রাতঃকালে আপনাদের সর্ব্বস্ব কুসুমরাশি দেবার্চ্চনায় উপহার দিয়া নিরাভরণদেহে প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িতেছিল, আর পরদিনের জন্য উত্তপ্ত বায়ুতে কলিকা ফুটাইতে ছিল।

আশ্রমের মধ্যস্থলে তন্ত্রসম্মত ত্রিকোণ গৃহ। রাজর্ষি স্বয়ং এই গৃহে বাস করেন। তাহার নীচে ভূমিগর্ভে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি গৃহে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনার স্থান। গৃহের মধ্যস্থানে গালিচা বিস্তৃত। তাহার উপর একখানি রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত চৌকিতে দুই চারি খানি পুথী। একপার্শ্বে পশ্চিমদেশপ্রচলিত খট্টার উপর কাষায়-বস্ত্র-মণ্ডিত শয্যা। তাহার মাথার নিকট কাষ্ঠাধারে অনেকগুলি পুথী। গৃহমধ্যে তিন চারিটি লাল ও নীল রঙ্গের কাচময় গোলক ঝুলিতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সন্ন্যাসীর নাম রাজা দেবীপ্রসাদ।

গৃহের মধ্যে চাহিয়া আছি, সহসা মেঝের একপার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার ঊর্দ্ধদিকে খুলিল। রাজসন্ন্যাসী যোগ সমাপন করিয়া উপরে আসিলেন।

রাজা দেবীপ্রসাদ জাতিতে ক্ষত্রিয় ; বর্ণ মলিন, আকার সুশ্রী ও বলিষ্ঠ, বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হইয়াছে। তিনি আমাকে ডাকিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; আমি সংস্কৃতে উত্তর দিলাম। আমাদের কথোপকথন চলিল; ভাবে বুঝিলাম সন্ন্যাসী আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজার অনুরোধে আমি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। আহারাদির পর তিনি শাস্ত্রীয় তর্ক তুলিলেন; তর্ক বাড়িয়া চলিল, তাহার সহিত বেলাও বাড়িয়া চলিল। তর্কের অবসান নাই, বেলার অবসান আছে ; গতিক বুঝিয়া আমি তর্ক বাক্যের মধ্যেই দাঁড়ি দিয়া বসিলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন " কোথায় যাও।"

" কাশীতে।"

" বিশেষ প্রয়োজন আছে ?"

" বিশেষ কিছুই নাই, তবে সেখানে বাসা আছে।"

থাকিলই বা ; অদ্য রাত্রিতে এখানেই থাকুন।" দুই চারি কথার পর আমি স্বীকৃত হইলাম।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথায় বার্ত্তায় জাগিয়া থাকাতে পর দিন উঠিতে বেলা হইল। উঠিয়া দেখি সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে নাই। শুনিলাম, তিনি যোগ করিবার জন্য তিনি তাঁহার গৃহনিম্নস্থ পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় না লইয়া যাওয়া অনুচিত মনে হইল। পরিচারকেরাও প্রভুর আদেশ আমাকে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমি স্বীকৃত হইয়া আশ্রমের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আশ্রমে মনের শান্তি পাওয়া যাইতেও পারে বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিয়া দুই এক দিন থাকিব সংকল্প করিলাম।

বেলা দুইটার সময় রাজা দেবীপ্রসাদ যোগ সমাপন করিয়া উপরে আসিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় তর্ক উঠিল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় আমাকে আবার থাকিতে অনুরোধ করিলেন ; পূর্ব্বদিনের ন্যায় আমিও সম্মত হইলাম। রাজা

দেবীপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। রাত্রিতে মহাভারত খুলিয়া তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। আমি সাধ্যমত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। পাঠান্তে নানা কথার পর বলিলেন, আপনি যদি আশ্রমে বাস করেন, আমার উপকার হয়, সংক্ষেপে বলিতেছি, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া আমি কাশীত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রমেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার আসিবার দুই চারি দিন পরে আর এক নূতন সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রমবাসী হইলেন। তাঁহার নাম যোগজীবন। কাশীতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। যে দিন একেবারে কাশী ছাড়িয়া আশ্রমে আসি, সে দিনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরম সুন্দর মূর্ত্তি, বচনমাধুরী ও রমণীয় স্বভাবে তিনি আমার শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। আশ্রমে আসিয়া তিনি দেবীপ্রসাদের নিকট বাসস্থান চাহিলেন। আমিও তাহার সপক্ষতা করিলাম, নির্জ্জনস্থানাভিলাষী হইলেও দেবীপ্রসাদ শেষে সম্মত হইলেন।

সামান্য কথাবার্ত্তা ও শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা যোগজীবন নির্জ্জনে ধ্যান করিতে অধিক ভাল বাসিতেন। দিবসের মধ্যে আমি প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। তিনি প্রায়ই আশ্রমের সর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী গৃহে একাকী থাকিতেন। রাত্রিতে যখন আমরা মহাভারত পাঠ করিতাম, তিনি আসিয়া নীরবে বসিয়া শুনিতেন, পাঠ সমাপন হইলেই উঠিয়া যাইতেন।

আশ্রমবাসী অন্যান্য লোকের মধ্যে রামটহল নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সহিত অত্যন্ত আত্মীয়তা করিতে আরম্ভ করিল। রামটহল লেখা পড়া জানে। সে আমাদের ক্ষুদ্র রাজসংসারের অধ্যক্ষ। রাজার নিকট মাসিক ৩০ টাকা বেতন পায়। আমার সহিত পরিচয় হইবার পর আমার সাহায্যে তাহার বেদান্ত পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পড়িবার সময় না হওয়াতে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

একদিন মহাভারত-পাঠান্তে যোগজীবন উঠিয়া যান, রামটহল বলিল "যোগজীবন, তুমি আলোক সহ্য করিতে পার না।"

যোগ। আমি আমোদ আহ্লাদ বা সংসারচিন্তার জন্য গৃহাশ্রম ত্যাগ করি নাই।

রাম। আমরা কি কেবল আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকি?

যোগ। তাহা আমি জানি না। থাকিলেও তাহাতে তোমার অধিকার আছে; তুমি সন্ন্যাসী নহ।

রাম। আমি গৃহীও নহি।

দেবীপ্রসাদ কহিলেন "যোগজীবন, তুমি কতদিন বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছ?—কতদিন তোমার সহিত আলাপ করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই—আমরা সকলেই সন্ন্যাসী; বলিতে আপত্তি নাই।

যোগ। বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আজিও পারি নাই।

দেবী। তোমার বাটী কোথায় ছিল?

যোগ। আমার বাটী ছিল না। আমি চিরকালই পরাধীন, চিরকালই নিরাশ্রয়।

দেবী। এত অল্প বয়সে সংসারত্যাগী হইলে কেন?

যোগ। সংসারে সুখ নাই।

দেবী। সংসারে সুখ নাই; বাস্তবিকই সংসারে সুখ নাই। সংসারের লোক মহামায়ায় বিমোহিত; অশেষ যন্ত্রণা পাইলেও সংসার ছাড়িতে পারে না। যোগজীবন, তুমিই ধন্য। তুমি কলিতে শুকদেব।

যোগজীবন দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেই দিন অবধি যোগজীবন আশ্রমবাসীদিগের নিকট অধিক পরিচিত হইলেন, অধিক গৌরবের পাত্র হইলেন; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা নির্জ্জন বাসের অভ্যাস গেল না।

# তৃতীয় পরিচ্ছদ।

বাণাশ্রমে অজ্ঞাতবাসে ছয় মাস অতীত হইল। দেবীপ্রসাদও মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে আরোহণ করিলেন। পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সন্ন্যাসী দুই তিন দিন নিতান্ত চিন্তামগ্ন রহিলেন। তাহার পর এক দিন রাত্রিতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ হরিচরণ, পাণ্ডবেরা যে মহাপ্রস্থানপথে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে সেই পথ ধরিয়া গেলে আমরাও স্বর্গে যাইতে পারি। এই শরীর লইয়া স্বর্গে গেলে সুখের সীমা নাই; কেবল মাত্র প্রাণবায়ু সেখানে যে সুখ সম্ভোগ করে, পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব সেখানে তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখী হইবে। আহার, নিদ্রা, ঘ্রাণ, পান শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুখের উপাদান। শরীরহীন জীব কেবল মাত্র নিদ্রাসুখভোগ করিতে পারে। ইহ জন্মে সকল ভোগে বঞ্চিত হইয়া তপস্যা করিলাম; স্বর্গে গিয়াও যদি কুম্ভকর্ণের মত কেবল নিদ্রা, তবে আর সুখভোগ কোথায় হইল? আমি সেই জন্য স্থির করিয়াছি, যত কিছু দুঃখ আছে, এই খানেই ভোগ হউক। আমি সকল ক্লেশ সহিয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সশরীরে স্বর্গে যাইব। সেখানকার অমৃত-বায়ু-স্পর্শে শরীর অজর ও অমর হইবে: আমরা দেবতাদিগের ন্যায় সুখী হইব। এ বিষয়ে তোমার মত কি?

তর্ক বলে আমাকে পরাস্ত করা ভিন্ন আমার মতে কার্য্য করিতে রাজার ইচ্ছা ছিল না। আমার সকল কথাই ভাসিয়া গেল। মনে মনে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া শেষে নীরবে রহিলাম। রাজা আপনাকে জয়ী মনে করিয়া স্বর্গযাত্রার কৃতসংকল্প হইলেন।

আশ্রমে অধিককাল বাস করিয়া আমার বিরক্তি জন্মিয়া ছিল; এখন হিমালয়ভ্রমণের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া আমি রাজার সঙ্গী হইতে চাহিলাম। তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গে যাইতেও পারিতাম না।

স্বর্গযাত্রার সঙ্গী বাড়ে, রাজার ইহা অনিচ্ছা নয়। তিনি একে একে আশ্রমবাসী সকলকেই অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই স্বর্গীয় সুখের প্রত্যাশায় পার্থিব

সুখে জলাঞ্জলি দিতে সম্মত হইল না। কেহ শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্ব্বলতা কেহ কোন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নাম উল্লেখ করিয়া নিষ্কৃতি পাইল। কেবল রামটহলেরই বিপদ; সে বলিল "আমি গেলে আশ্রমের দেবসেবার ব্যাঘাত ঘটিবে। পূজকদিগের উপর সমস্ত ভার দেওয়া যায় না।"

রাজা। আমি রামসীতা মূর্ত্তি কাশীতে বিশ্বনাথ স্বামীর নিকট দিয়া যাইব। দৈনিক শিবপূজার ভারও তাঁহার উপর থাকিবে।

রাম। বিষয় সম্পত্তির রক্ষা করিবে কে?

রাজা। আমি চিরকালের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিতেছি, আমার আর সম্পত্তির প্রয়োজন কি? আমার যাহা কিছু আছে, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান করিয়া যাইব।

রাম। সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

রাজা। কেন?

রাম। যদি আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, তখন অর্থাভাবে কষ্ট হইবে।

রাজা। যদি আসিতে না হয়?—তাহা হইলে ত আমার সম্পত্তি সৎপাত্রে ন্যস্ত হইল না; দান জন্য সুকৃতও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। সেই জন্য আমি নিশ্চয় করিয়াছি—উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যাইব।

রাম। আপনার সম্পত্তি আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে এখন হিমালয়-যাত্রা করিলে অচিরাৎ শরীর চিরনিদ্রিত হইবে।

রাজা। হইলই বা, তাহাতে ক্ষতি কি; আমরা পরকালে পরম সুখী হইব। তুমি চল; আমি তোমার অশুভাকাঙ্ক্ষী নহি। কি বল?

রাম। আপনি নিতান্ত অনুরোধ করেন, আমাকে যাইতেই হইবে; কিন্তু সম্পত্তি বিতরণ সম্বন্ধে আপনি যে সংকল্প করিয়াছেন—তাহা সদ্‌যুক্তিসঙ্গত নয়।

রামটহলের কথা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল না। আমি বলিলাম—'আপনাকে ফিরিয়া আসিতে না হয়, ভালই। কিন্তু যদি আসিতে হয়, তাহার নিমিত্ত একটা ব্যবস্থা আবশ্যক। উইলে বরং লেখা থাকুক, যদি উইলের দিবস হইতে এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে উইলের নির্দ্দেশানু-

সারে দানীয় ব্যক্তিরা সম্পত্তির অধিকার পাইবেন।" দুই চারি কথার পর রাজা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমরাও উঠিয়া গেলাম।

শয়ন করিয়া আমাদের ভাবী যাত্রার কথা ভাবিতে লাগিলাম। পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ উচ্চচূড় হিমালয়, হরিদ্বার, গোমুখী, গঙ্গোত্রি সমস্ত কল্পনা-বলে দেখিতে লাগিলাম। ভারতের জননী, ভারতের জীবন গঙ্গা,—যাঁহার তীরে পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যার আলোক প্রকাশ হয়, যাঁহার কূলে পর্ণকুটীরে সর্ব্বপ্রথম সরস্বতীর জন্ম—যাঁহার জল শত শত পুণ্যময় বেদগাতৃ মহর্ষির নিত্যস্নান-পূত ও ভারতভূমির স্বর্ণপ্রসবা শস্যের মূল,—যাঁহার সৈকত ভূমি জগতে সভ্যতার সৃষ্টিকর ঋষিদিগের উঞ্ছশস্যে ও ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগের যজ্ঞস্তূপে সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত, সেই গঙ্গার উদ্ভবস্থান ও উদ্ভবসময় কল্পনায় দেখিলাম। মন উৎসাহিত হইল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। শেষে উষাকালে তন্দ্রাভিভূত হইলাম।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমাদের প্রস্থানোদ্যোগ আরম্ভ হইল। রাজা রামটহলকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। রামটহল অন্যূন দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির তালিকা দেখাইল। রাজা আমার নির্দ্দেশ মত উইল করিয়া আড্ডাধারী, আখ্‌ড়াধারী, পাণ্ডা, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে সমস্ত দান করিলেন। গাজীপুরে রামটহলের এক সহোদর থাকিত, সে আসিয়া আপনার দাদা ও রাজার ভাবী চিরবিরহের জন্য অনেক কাঁদিল! রাজা তাহাকে পঞ্চাশ সহস্র টাকার সম্পত্তি দান করিলেন। রামটহলের অনুরোধে দেবসেবা ও আশ্রমের অধিকারও তাহার হইল।

রাজা দেবীপ্রসাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা ছিল; তালিকায়

তাহার উল্লেখ ছিল না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে রামটহল বলিল—"এই টাকার কিয়দংশ আমরা সঙ্গে লইয়া যাইব। আমাদিগের দীর্ঘ-যাত্রা সম্পাদন ও হিমালয়বাসী মোহন্তদিগকে দান করিবার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইবে। অবশিষ্ট টাকা উইলে নির্দ্দিষ্ট দানীয় ব্যক্তিগণ দক্ষিণাস্বরূপে পাইবেন। এ টাকা আপাততঃ আশ্রমেই থাকিল। উইলে আর তাহার নির্দ্দেশের আবশ্যক নাই।" রাজা দ্বিরুক্তি করিলেন না।

২রা আশ্বিন আমাদের হিমালয়-যাত্রার দিন। রামটহল আমাদের আবশ্যক দ্রব্যজাত নৌকায় বোঝাই করিয়া পূর্ব্বেই রেলওয়ে ষ্টেসনে যাত্রা করিয়াছিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজা যোগজীবন ও আমাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আমি আশ্রমে আসিয়াই সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়া ছিলাম। এতদিনে প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলাম। ক্ষণকালের জন্য বাড়ীর কথা মনে আসিল। পিতা মাতার কথা মনে আসিল; হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল। নাসারন্ধ্র দিয়া সেই হৃদয় বহ্নির উষ্মা বাহির হইতে লাগিল। আমি নৌকার ছাদের উপর আসিয়া বসিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নির্জ্জন প্রান্তর কলরবে পূরিয়া পাখীরা বাসায় চলিল; বায়ু শীতল হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুবেগে বহিল। সমস্ত আকাশ উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল। প্রকৃতির মোহনরূপে ভুলিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইলাম।

ক্রমে পশ্চিমাকাশের রক্তিমা মিলাইতে লাগিল। আকাশে খদ্যোতিকার ন্যায় ছোট ছোট তারা ফুটিতে লাগিল। দূরে গঙ্গার ঘাটের উপরেও এক একটি করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া আসিল। এখন প্রকৃতি শোভাময়। আমরা জলের উপর ভাসিতেছি; অনন্তকালসমুদ্রে প্রাণিবৃন্দের ন্যায় দূরপ্রসারিণী-গঙ্গাতরঙ্গে ভাসিতেছি। আমাদের চারিদিকে দীপমালা জ্বলিতেছে; মস্তকের উপর আকাশে, নীচে গঙ্গাজলে, পার্শ্বে তীর্থ-সোপানে দীপমালা জ্বলিতেছে। তীরদেশে ঘাটের নিকট গঙ্গার জলে আগুন লাগিয়াছে, জল জ্বলিতেছে—চাহিয়া দেখা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ নিষ্প্রভ চন্দ্র উদিত হইলেন। ক্রমে

পার্থিব বাষ্প ত্যাগ করিয়া পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরের সুশীতল-বায়ু-স্পর্শে শরীরের রক্তিমা অপনীত হইল। মনোহর দিব্যমূর্ত্তি আকাশের প্রান্তে শোভা ছড়াইতে লাগিল। কাশীর শুভ্রবর্ণ বাটী সকল শ্বেতবস্ত্রে অর্দ্ধশরীর আবৃত করিয়া ব্রতধারীর ন্যায় গম্ভীরভাবে দাঁড়াইল। কোলাহল কমিল। চন্দ্রের উন্মাদক আলোক প্রকৃতির পাগল পুত্রদের মস্তকে প্রবেশ করিল। তাহারা আমোদে মাতিয়া কলম লইয়া মায়ের ছবি আঁকিতে বসিল। আমরাও কাশীর অপর পারস্থ রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

অনেক রাত্রে গাড়ী চলিল। মোগল সরাই আসিয়া আমরা অন্য গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীর শব্দের নিদ্রাকর্ষিণী শক্তিতেই হউক, আর গাড়ীর গতিজাত নিদ্রাকর্ষক শরীর সঞ্চালনেই হউক, (এবিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতভেদ আছে) শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে নাইনি ষ্টেসনে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমরা প্রয়াগের নিকট আসিয়াছি। গাড়ী চলিল; আমি দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। অল্পক্ষণ পরেই যমুনা দৃষ্টিপথে পড়িল। বৃহৎ লৌহময় সেতু যমুনার উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালে যে শৃঙ্খলে ভারতভূমি বদ্ধ হয়, আজি সেই শৃঙ্খলে যমুনাও বদ্ধ। বাইরন্ বলিয়াছেন—ভূমির উপরই মনুষ্যের প্রভুত্ব; জলে তাহাদের অত্যাচার-চিহ্ন ক্ষণমধ্যে মিলাইয়া যায়। কবির উক্তি যদি সত্য হয়, তবে কেন আজ যমুনা মানুষের দত্ত লৌহ নিগড় গলায় পরিয়া রহিয়াছে?—যমুনাও কি ইংরাজকে ভয় করে?

একি সেই যমুনা?—যে যমুনার তীরে যদুনাথের মথুরাপুরী ভারত-ভুবনেশ্বরী দণ্ডায়মান ছিল, যাহার কূলে কদম্বমূলে বসিয়া জগতের অধিপতি বংশীধ্বনি করিতেন, সেই বংশীরবে ত্রিভুবন মোহিত হইত, জগতে নূতন জীবন আসিত, গোপকামিনীরা লক্ষ্মীরূপিণী রাধিকাকে অগ্রে লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিত—আকাশের পক্ষী, ভূতলের ভূচর, জলের জলজন্তু সকল আত্মবিস্মৃত হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিত,—সেই মোহন বংশীরব গভীরবাহিনী কালিন্দীর কাল জলে ভাসিয়া দূরদেশে চলিয়া যাইত, সুশীতল বায়ুতে চাপিয়া দিগ্ দিগন্তরে উড়িয়া যাইত—একি সেই যমুনা?—কবিবর জয়দেব যাঁহার কাল

জলের পার্শ্বে আপনার ইষ্টদেবকে স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার মাহাত্ম্য গান করিয়া স্বয়ং অমর হইয়াছেন—সেই যমুনা কি এই?—বলিতেও ইচ্ছা হয় না। যমুনা এখন আর ব্রজরাজের প্রিয় মহিষী নয়। নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনে এখন ইংরাজের ক্রীতদাসী। এখন আব সে নীল-জল-লহরী নাই। দুঃখে, শুষ্কহৃদয়ে, রৌদ্রে পুড়িতেছে। তাহাব অদৃষ্ট ভাবিলে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।

আমাদের গাড়ি সেতুর উপব আসিল। সম্মুখে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রস্তরময় দুর্গ। দূবদর্শী চতুর আকবব স্ববংশে বাজ্যের স্থায়িত্ব কামনায় উভয় নদীর সঙ্গমের উপর এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই এক দুর্গ দ্বারা উভয় নদী ও তাহাদের তীরবর্ত্তী সমস্ত রাজ্যের রক্ষা হইতে পাবে। কিন্তু এখন সে রাজবংশ কোথায়? যাহাদের প্রতাপে জগৎ সংসার কাঁপিত, সে মোগলবংশ কোথায়? নিজ দোষে ভারতরাজ্যের হেমদণ্ড তাহাদের হস্তস্খলিত হইয়াছে, সাত সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপের বণিকেবা আসিয়া তাহাদের সিংহাসনে বসিয়াছে। তাহাদের রক্ষাস্থান দুর্গ ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের শত্রুদিগের আশ্রয় হইয়াছে।

ভাগীরথী, এই চিবকলঙ্ক বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছ, লজ্জা হয় না? যখন হিমালয়ের চূড়া চূর্ণ করিয়া, পাষাণভিত্তি ভেদ করিয়া, ঐরাবত ভাসাইয়া, চলিয়া গিয়াছিলে; যে তেজে পৃথিবী রসাতলে যায়, স্বয়ং শঙ্কর ভিন্ন আর কেহ যে তেজ ধরিতে সমর্থ নয়—সে তেজ এখন কোথায়? তোমার যে প্রভাব, যে মহিমা পারস্য, আরব, যুনানী দেশ-ভেদ কবিয়া রোমক রাজধানীতে প্রবেশ কবিয়াছিল—সে প্রভাব কোথায় গেল?—যে জলরাশিতে ভারতভুবন প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছিলে, সেই জলবাশিতে ভারতভূমি আবার ডুবাইয়া দাও; চিরকলঙ্কের চিহ্ন সকল লোপ কর। ভারত রসাতলে যাক। এরূপ কলঙ্কের ডালি মাথায বহিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই বৃদ্ধ ভারতের মঙ্গল।

যমুনে, চিরকাল রাজরাজেশ্বরী থাকিয়া, কালামুখি, এখন দাসত্ব করিতেছ! বর্ষাকালে তোমাব প্রভাববৃদ্ধি হয়—তখন দরিদ্র কৃষক ও বণিকের সর্ব্বস্ব নাশ কবিয়া তাহাদের উপর এই অপমানের জন্য রাগ প্রকাশ কর। তখন

উন্মত্তা হও। এখন অসচ্চরিত্র, ব্যয়িত-সর্ব্বস্ব ধনবানের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছ, শুষ্ককণ্ঠে পাতালের নিকট যাইয়া জল চাহিতেছ! তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, লক্ষ স্বুবর্ণব্যয়ে তোমার উপর যে এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা বিক্রয় করিয়া জল কিনিলে দেশের উপকার হয়।

যোগজীবন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, দুর্গের মধ্যে বস্ত্রশূন্য উচ্চ কেতুদণ্ড দেখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল "ওটা কি?"

আমি বলিলাম " ওখানে চাবুক টাঙ্গাইয়া রাখে। আগে ওখানে মুসলমানের নাগরা টাঙ্গান থাকিত।

"চাবুক টাঙ্গাইয়া রাখে কেন?"

"মারিবে বলিয়া: যে কথা কহিবে, তাহাকেই মারিবে।"

যোগজীবন বিস্মিত হইয়া বলিল "আমারাও ত এই কথা কহিতেছি।"

"আমি বলিলাম ও কথা নয়—ও কিচির মিচির!"

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিল। নদীসম্বন্ধে প্রয়াগ যেরূপ ত্রিবেণী, বেলওয়ে সম্বন্ধেও সেইরূপ। হিমালয়ের প্রান্ত ও পশ্চিম সমুদ্রের তীর হইতে দুই বিস্তীর্ণ রেলওয়ে আসিয়া এখানে মিলিয়াছে। তাহার পর একত্রে পূর্ব্ব সাগরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বেলপথ ষ্টেসন হইতে দুর্গাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এটি রেলওয়ের গুপ্ত সরস্বতী।

দুইটি নূতন লোকে আসিয়া আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। তাঁহাদের একজন ছিন্নবস্ত্র, মলিন জামা, পরিস্কৃত নূতন খেস ও ছিন্ন হাপবুটে পরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তি পেণ্টালুন ও চাপকানে স্বসজ্জিত।

প্রথম ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিয়াই চক্ষু বুজাইলেন। আমরা প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া গাড়ীতে আসিলাম। অনেক্ষণের পর গাড়ী চলিল। তাহার দুই দণ্ড পরে তিনি চক্ষু চাহিলেন। আগন্তুকদিগের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। কথায় বুঝিলাম, প্রথম ব্যক্তি এক নূতন মিশনরি, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তার।

ডাক্তার পরিহাসচ্ছলে ইংরাজিতে বলিলেন—এই ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদও তত রহস্যজনক নয়। আপনারা ইহাদিগকেও বাড়াইয়াছেন। মিশনরি বলিলেন "সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র আত্মা, সর্ব্বাপেক্ষা মলিন ও অপরিষ্কার শরীরে বাস করে। আত্মার ধর্ম্মই এই। আমাদের মতে লোকের ধর্ম্ম-পরায়ণতা শরীরের ও পরিচ্ছদের প্রতি অমনোযোগের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অপরিষ্কার থাকেন, তিনি সেই পরিমাণে ধার্ম্মিক। কিন্তু লোকে এখন আর বড় ধার্ম্মিক হইতে চায় না। পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইল। তাহারা বুঝে না যে ছিন্ন বস্ত্র ও মলিন বেশ দেখিয়া পাপপুরুষ দূর হইতে পলায়ন করে; আর সুন্দর বেশভূষা ও সীমন্ত-শোভিত মস্তক তাহার প্রিয় বাস-স্থান।

মিশনরির কথা ডাক্তারের বড় গায়ে লাগিল। তিনি অনেক বড় বড় মিশনরি, শেষে ভারতবর্ষের পোপকে লইয়াও টান দিলেন। মিশনরিও ক্রুদ্ধ হইয়া ডাক্তারদিগের অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কানপুরের এক ডাক্তার সেই সময়ে যে এক নূতনবিধ অভিনয় দেখাইয়া ছিলেন, তাহাও বর্ণন করিলেন। ঘটনাটি কৌতুক-কর বলিয়া আমি যত্নে মনে রাখিয়াছি। স্থূল মর্ম্ম এই,—কানপুরের এক ডাক্তার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হন। গৃহস্বামীর শিরঃপীড়া ছিল। আহারের সময় অন্যান্য কথার সহিত তিনি আপনার পীড়া সম্বন্ধেও দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহার দুই তিন দিন পরে ডাক্তার রাত্রিতে গিয়া মেডিকাল উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া ভিজিটের টাকার বিল করিয়া পাঠাইলেন। ভদ্রলোকটি ক্রোধান্ধ হইয়া টাকা দিলেন এবং তাঁহার বাটীতে ডাক্তার যে মদ ও অন্যান্য দ্রব্য ভোজন করিয়া গিয়াছিলেন—তাহার এক বিল পাঠাইলেন। ডাক্তার টাকা দিয়া পুলিষে সংবাদ দিলেন—অমুক লোক লাইসেন্স না লইয়া মদ বিক্রয় করিয়াছে। মোকদ্দমায় ভদ্রলোকটি পরাজিত হইয়া ভিজিটের টাকা দিলেন।

উভয়ে মহা বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। দেবীপ্রসাদ এত ক্ষণ মুদ্রিতনয়নে স্বর্গ-সুখ চিন্তা করিতেছিলেন। কোলাহলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি বিবদমান আগন্তুকদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সর্ব্বাগ্রে মিশনরির পরিচয় দিলাম—তিনি এক ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্ম মানেন না। দেবসেবা তাঁহাদের মতে নিষিদ্ধ।

দেবী। ভাল উহাকে জিজ্ঞাসা কর—দেব সেবায় উহাদের আপত্তি কি?

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—মিশনরি শুনিয়া এবার স্বয়ং উত্তর দিলেন—"দেব সেবা করিতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে। মূঢ়েরাই দেব সেবা করে।"

দেবী। নির্ব্বোধ, দেবসেবা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয়, তবে তিনি আমাদের উপাস্য দেব ও দেবমূর্ত্তি সকল ধ্বংস করেন না কেন?

মিশ। মনুষ্যেরা যদি কেবল নিষ্প্রয়োজন বস্তু ও পুত্তলীর পূজা করিত, তাহা হইলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিনষ্ট করিতেন। কিন্তু মানুষেরা ঐ সকল বস্তু ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক বস্তুরও উপাসনা করে। জ্ঞানময় ঈশ্বর কয়েকজন ভ্রান্ত মনুষ্যের উপকারার্থ তাঁহার সৃষ্টিনাশ করিতে পারেন না।

দেবী। ভাল, এই সকল আবশ্যক বস্তু রাখিয়া অবশিষ্টগুলির বিনাশ করিলে ক্ষতি কি?

মিশ। তাহা হইলে মানুষেরা ভাবিবে—যখন ঈশ্বর এই সকল উপাস্য বস্তু নষ্ট করিলেন না, তখন নিশ্চয়ই ইহাদের আরাধনা তাঁহার অভিপ্রেত।

আমাদের গাড়ী কাণপুরে আসিল। তখন বেলা প্রায় দুইটা। অনেকে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। ডাক্তার বাবুও চলিয়া গেলেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাণপুরে একটি নূতন লোক আসিয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। মিশ-

নরির সহিত তাঁহার আলাপ হইল। পরিচয়ে জানিলাম—তিনি কলিকাতার কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক; শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। সম্পাদক মিরট যাইতেছিলেন। তিনি মিশনরিকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশনরি লাহোর পর্য্যন্ত যাইবেন। পথে দিল্লী, মিরট, অম্বালা,ও যদি সুবিধা হয়, একবার কুরুক্ষেত্র দেখিয়া যাইবারও ইচ্ছা আছে।

কুরুক্ষেত্রের নামে সম্পাদক শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন "দেখুন, কুরুক্ষেত্রের নামে আমার হৃৎকম্প হয়। কুরুক্ষেত্রে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আপনি ইতিহাস জানেন—নন্দঘোষের পুত্রই এই সর্ব্বনাশের মূল। তিনি ভারতবর্ষের নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। তাঁহারই বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তির পরিতোষ জন্য মগধে, মথুরায়, বীরচক্র নিহত হইল। তাঁহারই মন্ত্রণায় অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বাহিব হইয়া সাহসী, বলবান যোধদিগের বিনাশ সাধন করিলেন; রাজাদিগের ধন ও তেজ হরণ করিলেন। তাঁহারই কুচক্রে, সেই দুরন্ত রাক্ষসীস্বরূপ রণভূমিতে ভারতের লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান ধরাশায়ী হইল—সেইখানে সেই দিনে, ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের মত ডুবিল। ভারতের জয়লক্ষ্মী সেইদিন অবধি পৃথিবী ত্যাগ করিলেন।"

মিশ। আপনার কথা মিথ্যা নয়। সকল দিকেই কৃষ্ণের অশেষ গুণ। আর এই কৃষ্ণই আমাদের দেশীয় অবোধ লোকদিগের উপাস্য দেব। উঃ কৃষ্ণ আমাদের কি ভীষণ শত্রু!

সম্পাদক। কেবল ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নয়। এত করিয়াও নরশোণিতলোলুপ কৃষ্ণের জিঘাংসাবৃত্তি পূর্ণ হইল না। প্রভাসে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাদব, অন্ধক ও ভোজবংশীয় কুরুক্ষেত্রাবশিষ্ট বীরদিগকে মদ্যমত্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। বীবজননী ভারতভূমি বীরশূন্যা হইলেন, তাহার অল্পদিন পরেই কয়েকজন গ্রীক আসিয়া নিরাশ্রয়, অসহায় ভারত সন্তানদিগের গলে দাসত্বশৃঙ্খল পরাইল। সেই শৃঙ্খল সেই অবধি আমাদের গলায় রহিয়াছে। গৃহপালিত মহিষের ন্যায় আমরা ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও হীনতেজ হইয়া তাহাতে—সেই ঘৃণিত শৃঙ্খলবন্ধনে—অভ্যস্ত হইতেছি। সেই অবধি আমাদের এই দুর্দ্দশা; সেই অবধি ভারতের উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে।

সেই অবধি বীরপ্রিয়া, স্বাধীন-সহচরী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে বাস করিতেছেন।

সম্পাদক এইরূপে নানা বিষয়ে বিদ্যার ও "চিন্তাশীলতার" পরিচয় আরম্ভ করিলেন। যোগজীবন দাঁড়াইয়া বলিল "দেবনিন্দকদিগের কথা শুনিতে আপনার আমোদ হইতেছে? আসুন, সন্ধ্যার শোভা দেখা যাক।"

আমরা গাড়ীর দ্বারসমীপে দাঁড়াইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। সূর্য্যের অগ্নিময় রক্তবর্ণ সোণার থাল আকাশের নীচে ডুবিতে লাগিল। পশ্চিমাকাশে কাল কাল অল্পপরিসর মেঘগুলি প্রকৃতির নীলাম্বর কাপড়ের পাড়ের ন্যায় শোভা দিতে লাগিল। সূর্য্যদেব তাহাতে আগুন লাগাইয়া গা-ঢাকা দিলেন। মেঘ জ্বলিতে লাগিল। তাহার ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে অগ্নির শিখা উপরে উঠিল। দূরবর্ত্তী রৌদ্রশুষ্ক মেঘে আগুন ধরাইয়া দিল। চারিদিক শীতল আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হরিৎক্ষেত্র সকল সুবর্ণপ্রভায় রঞ্জিত হইয়া রেশমি বস্ত্রের ন্যায় ঝকিতে লাগিল। আমরাও এটোয়াতে আসিয়া পহুঁছিলাম।

গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদের আবশ্যক ক্রিয়া সকল প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে,—ঘণ্টা বাজিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া গাড়ীতে পুনরারোহণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। রামটহল ও যোগজীবন গাড়ীতে বসিয়াছিল। আমি রাজা দেবীপ্রসাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে গাড়ীর দিকে চলিলাম। সহসা ষ্টেসনের ভিত্তিতে একখানি ছাপার বিজ্ঞাপনে আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—"প্রায় সাত মাস অতীত হইল, আমার পুত্র শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হরিচরণ প্রায় গৌরবর্ণ, শরীর দোহারা, মুখে অল্প দাড়ী ও গোঁফ আছে; নাক বড়, কপাল প্রশস্ত, চক্ষু ছোট ও উজ্জ্বল। বামহস্তে একটা কাল দাগ আছে। বয়স ২৪ বৎসর। উত্তম ইংরাজি ও সংস্কৃত জানে। যে ব্যক্তি তাহার সন্ধান করিতে পারিবে, তাহাকে উপরি লিখিত ১০০০ টাকা পুরস্কার দিব।"

নীচে পিতার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে।

বিজ্ঞাপনটি প্রথমে দেখিয়া মনে সহসা প্রবল আবেগ উপস্থিত হইল। পড়িতে পড়িতে বারম্বার আপাদমস্তক ভিতরে বজ্রাহত উঠিল। রক্তস্রোত অতিবেগে মস্তকে উঠিতে লাগিল। আমি ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হইলাম।

রেলওয়ের গভীর সোঁ সোঁ শব্দে আত্মবিস্মৃতি অপনীত হইল। চাহিয়া দেখি, গাড়ী অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। যোগজীবন ও রাজা দেবীপ্রসাদ উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতেছেন। আমি বিমূঢ়ভাবে গাড়ীর দিকে দৌড়িয়া গেলাম। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে উঠিতে যাওয়া নিষিদ্ধ, ইহা তখন মনে আসিল না। আমি গাড়ীতে উঠিবার প্রয়াস পাইয়া পুলিষের হস্তে বন্দী হইলাম।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুলিষের লোকেরা আমাকে ষ্টেসনের এক পার্শ্বে লইয়া গেল। আমি জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভূমির উপর বসিলাম।

মানসিক যাতনায় যখন প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে এক চৌকিদার আমাকে ধাক্কা দিল। আমি মাথা তুলিলাম না। আবার এক ধাক্কা; এবার দুই চারিটা গালাগালির সহিত বিলক্ষণ বলে ধাক্কা; আমি পড়িয়া গেলাম। আকস্মিক ক্রোধবশে দুরাত্মার হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া তাহার এক আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিলাম।

ষ্টেসনে মহা গোলযোগ হইল। এক বাঙ্গালি বাবু ছুটিয়া আসিলেন, আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিতে চাহিলাম! বাবু ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। চৌকিদারদিগকে প্রহার করিতে ও আমাকে শ্রীঘরদর্শনে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়া ক্ষুদ্র নবাব বেগে চলিয়া গেলেন।

বাবুর কথায় প্রশ্রয় পাইয়া মুসলমান চৌকিদার আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। ষ্টেসনে কয়েকজন ব্রাহ্মণ চাকর ছিল। মুসলমানে সন্ন্যাসীকে মারিতে

উদ্যত দেখিয়া তাহারা আমার পক্ষ হইল। মুসলমানের দিকেও তিন চারি জন আসিল। সুখের বিষয় এই, ইহাদের বিবাদ মুখ হইতে হস্তে নামিল না।

দুই দলে বচসা হইতেছে, ষ্টেসনের কর্ত্তা সাহেব পূর্ব্বোক্ত বাবুকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিলেন। আমি টুপি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিলাম এবং ইংরাজিতে আপনার অবস্থার কিয়দংশ ও তাহার পর চৌকিদারের অত্যাচার, বাবুর ব্যবহার, একটু কাতরভাবে বর্ণন করিলাম। সাহেবের মন ভিজিল। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ষ্টেসনের বাহির হইলাম। ব্যাকুলহৃদয়ে অন্য মনে মাঠে চলিলাম। অনেকক্ষণের পর একটি বাঁধান কূপ সম্মুখে পড়িল। অন্য মনে তাহার উপর বসিলাম।

অল্পক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। পৃথিবীর অন্ধকার চন্দ্রের ভয়ে পলাইয়া আমার মনের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল। যন্ত্রের রুদ্ধবাষ্প বাষ্পাধারের ন্যায় দুঃখে হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

কার্ত্তিক মাস; চন্দ্রমা উদিত হইয়া অবিশ্রান্ত তুষারবর্ষণে ব্যাপৃত হইলেন; চারিদিকে হিমময় সিক্ত শুভ্র বসন বিস্তৃত হইল। আমি উত্তরীয় বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিলাম। আজি আমি প্রকৃত সন্ন্যাসী। সমস্ত পৃথিবী আমার বাসগৃহ; অনুজ্জ্বল হীরকমালায় সুশোভিত সমুজ্জ্বল নীলাম্বর আমার গৃহের উপর বিস্তীর্ণ। ভূমিতল শয্যা; মাঠের বৃক্ষ গৃহসজ্জা। শীতল পশ্চিম বায়ু রক্ষসেবায় নিযুক্ত। কেবল শান্তির অভাবে চিন্তা সহচরী; সংযমের অভাবে দুঃখানুভব সহচর।

আজি আমি এ অবস্থায় কেন? কেন গৃহত্যাগী হইলাম? স্থির বলিতে পারি না। তবে আমি সুখান্বেষী, শান্তির ভিখারী। সুখ কোথায়? তাহাও জানিনা। অমৃতময়ী মোহিনী শান্তি! নিশ্চয় জানি, তুমি আমার হইবে না; আমি তোমায় পাইব না; তথাপি তোমার অন্বেষণে চিরজীবন ভ্রমিব। দেশে দেশে, নগরে নগরে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইব। তোমার চিন্তায়, তোমার অন্বেষণে যে সুখ, তাহাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাঁহার উদ্দিষ্ট রত্ন স্পর্শমণি না পাউন, কিন্তু

তাহার অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া যে নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহাতেই তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার যত্ন, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কৃত হয়।

আমাকে না বলিয়াই চন্দ্রমা ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে চলিলেন। পশ্চিম-বায়ু রাত্রিশেষে ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া, আরও শীতল হইয়া বহিল। পূর্ব্বকালের রাজারা জল ও অগ্নিতে অপরাধীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন; আজি রাজ-রাজেশ্বরী প্রকৃতি বায়ুতে আমার পরীক্ষা লইতেছেন। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলাম; দেখি সম্মুখে দণ্ডায়মান মনুষ্য মূর্ত্তি। বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কে?"

উত্তর। "যোগজীবন।"

"যোগজীবন?—তুমি কোথা থেকে আসিলে?"

যোগ। ষ্টেসন থেকে। আমি যশোবন্ত নগরে নামিয়া তাহার পরের গাড়িতে এটোয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

"কেন?"

যোগ। তোমাকে বিপদের মুখে দেখে গিয়াছিলাম বলিয়া।

"রাজা কোথায়?"

যোগ। তিনিও নামিতে চাহিয়াছিলেন—রামটহল অনেক যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে গাজিয়াবাদে লইয়া গিয়াছে। সেখানে তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন।

আমি। তুমি একা আসিলে?

যোগ। হাঁ; আমি রামটহলের যুক্তিতে ভুলি নাই।

আমি। এখানে কিরূপে আসিলে?

যোগ। ষ্টেসনে আসিয়া শুনিলাম, তুমি মুক্ত হইয়াছ। কোথায় আছ, কেহ বলিতে পারিল না। ষ্টেসন হইতে বাহিরে আসিতেছি, একস্থানে দুই মুসলমান চৌকিদার পরস্পর কথা কহিতেছে—তাহাদের একজন বলিল বেটা মোহন্ত বড় ফাঁকি দিল। আমি মনে করে ছিলাম, বেটা আমার হাতে মর্‌বে বলেই সাহেবের কাছে খালাস পেলে; কিন্তু বেটা মহুয়াবাগের মাঠে পড়ে

অন্ধকারে যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে, হিমে ঘুরে ঘুরে অবশ হয়ে পড়িছি।

আমি। তার পর।

যোগ। আমি বুঝিলাম তোমারই কথা হচ্চে। শেষে তাই স্থির হ'ল। কথাগুলি সব মনোযোগ করে শুনিলাম। তার পর বাহিরে এসে মহুয়াবাগের কথা জিজ্ঞাসা করে, মাঠে পড়িলাম।

আমি। কেন ষ্টেসনে থাকিলেই ত হইত।

যোগ। তখন ও কথাটি মনে আসে নাই।

আমি। কতক্ষণ মাঠে ঘুরিতেছ ?

যোগ। বলিতে পারি না।

আমি মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। যোগজীবনও নীরবে কূপের উপর আমার পার্শ্বে বসিল। অনেকক্ষণের পর বলিলাম "যোগজীবন, তোমার কি সকল মানুষের উপরই এইরূপ ভাব ?"

যোগ। হওয়া উচিত।

আমি। যোগজীবন, তুমি অলৌকিক মনুষ্য। পৃথিবীতে তোমার মত লোক আর আছে কিনা সন্দেহ।

যোগ। আমি ততদূর প্রশংসার যোগ্য নহি। আমি বলিয়াছি "হওয়া উচিত।" এই ব্রত লইব মনে করিয়াছি মাত্র।

আমি। মনের সংকল্প কাজেও দেখাইলে। পূর্ব্বেও হয়ত এরূপ ঘটনা কত হইয়াছে।

যোগ। আর কখন হয় নাই। বিশেষতঃ অন্যের জন্য বোধ হয় এতদূর করিতে পারিতাম না।

আমি আর কিছু বলিলাম না। যোগজীবনও তাহার স্বাভাবিক মৌনভাব অবলম্বন করিল।

প্রভাত হইল। পাখীরা তাহাদের নিত্য আহারদায়িনী দিবার সম্মানার্থ আগমনী গাইতে লাগিল। দিবার প্রিয়সখী ঊষা নবীন শ্যামল শস্যপত্রে মুক্তামালা গাঁথিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। শীতার্ত্ত বৃক্ষবাসী ও বনচরদিগের

ক্লেশ নিবারণের আদেশ বাহির হইল। পূর্ব্বদিকে আনন্দ অগ্নি জ্বালিত হইল। তাহার উজ্জ্বল শিখা আকাশে উঠিয়া নিশার কুহক জাল দগ্ধ করিল। অমৃত-সিঞ্চনে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত সেনার ন্যায় পৃথিবীর প্রাণিকুল নূতন জীবন পাইল। জগৎ সংসার নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। আমরাও কৃপতীর ত্যাগ করিয়া ষ্টেসনের দিকে চলিলাম।

পথে যাইতে যাইতে যোগজীবনের ম্লানমুখ ও অলস চক্ষু দেখিয়া আমি বলিলাম "যোগজীবন, তুমি আমার জন্য এই ভয়ানক কষ্ট পাইলে—ইহাতে আমার বড় ক্লেশ হইতেছে।"

যোগ। আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছি মাত্র। ও কথার আর উল্লেখ করিও না।

আমি। তুমি ত আশ্রমে আমাদের সহিত অধিক আলাপ করিতে না; আমরা কেহই এ পর্য্যন্ত তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই।

যোগ। সেরূপে জানাইতেও আমার ইচ্ছা নাই। বার বার ও কথার উল্লেখ করিলে আমি দুঃখিত হইব।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমরা ষ্টেসনে আসিয়া পহুঁছিলাম, গাড়ীও ষ্টেসন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অগত্যা এক দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দিবসের মধ্যে রাজার নিকট হইতে দুই বার টেলিগ্রাম আসিল। সন্ধ্যার পর আমরা গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিলাম। শরীরের সম্পূর্ণ অবসাদ জন্মিয়াছিল। শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, গাড়ী মাঠ ও শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মন্দবেগে চলিতেছে। যোগজীবন হাসিয়া বলিল—সকলেই বিশ্রাম করে, গাড়ীর বিশ্রাম নাই। দিন নাই, রাত্রি নাই ক্রমাগতই চলিতেছে। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র মাথায় করিয়া এক দেশের লোক অন্য দেশে লইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বদিন সমস্ত দিবস দোকানে নানাপ্রকার কথা বার্ত্তায় লিপ্ত থাকিয়া যোগজীবনের সহিত আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। আমার নিকট তাহার মৌনভাবের অপনয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম। তাহার কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। বলিলাম—কবিকুলের শিরোভূষণ কালিদাস কল্পনাবলে দেখিয়া ছিলেন, সিদ্ধপুরুষেরা হিমালয়ের নিম্ন সানুতে বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইয়া মেঘবৃষ্টির সীমাতীত ঊর্দ্ধ সানুতে যাইয়া রৌদ্র সেবন করিতেছেন; আমরা মনুষ্য হইয়াও এখন রেলওয়ের প্রসাদে সেই সুখ অনুভব করি। আমাদের এই গাড়ী দক্ষিণ সাগরের কূল হইতে এতদূর আসিতে যাত্রীদিগকে লইয়া কতবার বৃষ্টিতে স্নান করিয়াছে, আবার রৌদ্রে শুখাইয়াছে; কত বার যে প্রবল বায়ুবেগ সহিয়াছে ও নিবিড় কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়াছে, বলা যায় না।

বেলা প্রায় সাতটার সময় আমাদের গাড়ী গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখি, রাজা দেবীপ্রসাদ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া রাজার মুখ প্রসন্ন হইল। আমরা নানা কথায় বিপণিগৃহে বাসায় আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম, রামটহল আমাদের হিমালয় যাত্রার উদ্যোগার্থ সাহারণপুরে গিয়াছে। আমরাও সমস্তদিন বিশ্রাম করিয়া রাত্রি দশটার পর সাহারণপুরে উপস্থিত হইলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়া আমার দৈনিক নিয়মানুসারে ভ্রমণে বাহির হইলাম। বাহিরে অত্যন্ত শীত বোধ হওয়াতে দেহাবরণ বস্ত্র লইবার জন্য আবার বাসায় আসিতে হইল। ঘরে যাইবার সময় যোগজীবনের ঘরে রামটহলের স্বর শুনিতে পাইলাম। রামটহল আমার নাম করিতেছে শুনিয়া দাঁড়াইলাম। রামটহল বলিল "যোগজীবন, তুমি রাজার মহা উপকার করিয়াছ। হরিচরণের নিকট রাজার ১০ হাজার টাকার নোট ও মোহর আছে, সে সেইগুলি লইয়া পালাইতেছিল— তুমি যদি ফিরিয়া না যাইতে, রাজাকে এই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত।

যোগ। তুমি কিরূপে জানিলে—গুরুজী টাকা লইয়া পালাইতেছিল?

রাম। তাহা আবার জানিতে হয়, এটোয়া ষ্টেসনে আমরা হাজার বার

ডাকিলাম, চাহিল না, আসিল না; মনে করিল, গাড়ী বাহির হইয়া গেলেই টাকাগুলি তাহার হইল। তুমি আবার রাত্রিতে মাঠের মধ্যে গিয়া তাহাকে ধরিবে, তাহা তখন বুঝিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য এই, রাজা কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

যোগ। রাজা তোমার মত পাপী নহেন, যে একজন সাধুপুরুষকে চোর বলিয়া বিশ্বাস করিবেন।

রাম। আমি পাপী, আর হরিচরণ সাধু?

যোগ। সহস্রবার।

রাম। একটু সাবধান হইয়া কথা বল।

যোগ। আমি তোমাকে ভয় করি না।

রাম। সাবধান, নহিলে ভিতরের কথা বাহির করিয়া দিব।

যোগ। তাতে আমি আর ভয় করি না। এখন আর আমি আশ্রমবাসী নহি। আর—বিপদে পড়িলে গুরুজী এখন আমার সহায় হইবেন।

রাম। দুই দিন গুরুজীর সঙ্গে থাকিয়া এত ভক্তি হইয়াছে! ভাল তবে দেখিব তুমি আমায় পোষ মান কি না?

দোকানের এক ভৃত্য এই সময়ে সেই খানে আসিল। আমি আর চোরের ন্যায় দ্বারদেশে না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেলাম। কথার শেষ অংশ রহস্যপূর্ণ মনে হইল। অবসর ক্রমে যোগজীবনকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। যোগজীবন বলিল—"এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না; সময় উপস্থিত হইলে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব।"

আমি। একটি কথা বলিলে বড় সুখী হইব। রামটহল তোমাকে কি ভয় দেখাইল। কোন্ বিষয়েই বা তুমি আমার সাহায্য চাও; আমিই বা তোমার কি সাহায্য করিতে পারি।

যোগ। প্রয়োজন হইলে বলিব।

আমি। এখন না বলিলে আমি সাহায্য করিব না।

যোগজীবন হাসিয়া বলিল "করিবে না?"

আমি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম "করিব।"

# নবম পরিচ্ছেদ।

প্রস্থানের উদ্যোগে তিন দিন অতীত হইল। চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে অশ্বের উচ্চ চীৎকারে শয্যা ত্যাগ করিলাম। আমাদের আদেশ মত ছয়টি পাহাড়ী ঘোড়া বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত। তাহাদের তিনটি রাজা দেবীপ্রসাদ, রামটহল ও আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। অপর তিনটি আমাদের দ্রব্যসামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কোন প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যোগজীবনের বিশেষ আপত্তি। গত তিন দিবস ধরিয়া আমরা তাহাকে অশ্বে যাইতে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলাম; কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। আমাদের সকলের অগ্রে অগ্রে বাল সন্ন্যাসী যোগজীবন পদব্রজে চলিল।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা সহরের বাহির হইলাম। দূরে মেঘ মালার ন্যায় হিমালয় দিক্‌চক্র ব্যাপিয়া, দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া রহিয়াছে। উপরে তুষারধবল, নীচে তমালশ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী নবীন সুবর্ণালোকে মোহনমূর্ত্তি ধরিয়াছে। আমি মোহিত হইলাম। জগৎপতির অতুল মহিমা, অতুল প্রভাবদ্যোতক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, আর্য্যদিগের স্বর্গ, গঙ্গার উৎপত্তিস্থান, ভূতনাথের আবাস ভূমি, যক্ষ,রক্ষ, গন্ধর্ব্বদিগের আরামনিকেতন, অপ্সরা ও কিন্নরদিগের কেলিগৃহ, পর্ব্বতরাজ হিমালয় সম্মুখে অত্যুন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান দেখিয়া মন উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোতের ন্যায় জ্ঞানের স্রোতঃ ঐ স্থান হইতেই প্রথম বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গিয়াছে, উহারই হিমমণ্ডিত শিলাতলে বৃক্ষ মূলাশ্রয়ে থাকিয়া যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য, মহর্ষি পরাশর নূতন ধর্ম্মসংহিতা পৃথিবীকে প্রথম উপহার দেন। মহাকবি কালিদাস মোহিতচিত্তে হিমালয়ে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহাকে বিশ্বনাথের শ্বশুরপদে বরণ করিয়াছেন।

নানাপ্রকার সুখের চিন্তায় মগ্ন হইয়া নূতন দেশে চলিলাম। চারিদিকে নয়নরঞ্জন হরিৎ ক্ষেত্র। কৃষকেরা হৃষ্টচিত্তে সংসারের আহারীয় প্রস্তুত করিতেছে। পাখীরা উদরপূর্ণ করিয়া মনের সাধে গাইতেছে। দূরে দুই একটা

গরু মনের সাধে লাফাইতেছে—যে দিকে দেখি, কেবল আনন্দ, কেবল উৎসব, আমি আত্মবিস্মৃত হইলাম।

বেলা দুই প্রহরের সময় একটি ক্ষুদ্র নদী আমাদের পথ রোধ করিল। আমাদের ভারবাহক অশ্বেরা আপনা হইতে আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল; নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই সময়ে অন্য পথ দিয়া এক দীর্ঘকায়, অতীক্রান্ত যৌবন সন্ন্যাসী অর্দ্ধ শুভ্র জটাভার মস্তকে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি একেবারে নদীতীরে গিয়া পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। যোগজীবনও তাঁহার অনুগামী হইয়া নদীতীরে এক শিলাখণ্ডের উপর বসিল।

দেবীপ্রসাদ অশ্বপৃষ্ঠে নদী পার হইবেন বলিয়া ঘোড়াকে সঙ্কেত করিলেন, ঘোড়া নড়িল না। অবশেষে প্রহার। ঘোড়া পা ছুড়িতে লাগিল। দেবীপ্রসাদ কিছুতেই ছাড়িবেন না; ঘোড়াও তাঁহার ন্যায় দৃঢ়সংকল্প। প্রহার চলিল। নবাগত সন্ন্যাসী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া হস্তসঞ্চালনে রাজাকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। আমি বলিলাম বোধ হয় নদীর জল অত্যন্ত গভীর; সেই জন্য ঘোড়া অগ্রসর হইতেছে না। রাজা নদীর দিকে চাহিলেন। নদী পার হইবার অন্য উপায় দেখা গেল না। স্বর্গযাত্রার পথে বিঘ্ন তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ঈশ্বর ঘোড়াদিগকে সকল ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, অনেক মনুষ্য অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিও দিয়াছেন; কিন্তু কথা কহিবার শক্তি দেন নাই। এই অপরাধে অসহায় পশু ভয়ানক প্রহার সহিল; শেষে উত্যক্ত হইয়া নদীতীরে গেল। নদীতীরে একস্থানে দুই প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে এক অতি অল্প-পরিসর স্থান ছিল। ঘোড়া রাজাকে সেইখানে লইয়া গেল। তাঁহার পদদ্বয় উভয় পার্শ্বস্থিত প্রস্তর স্পর্শ করিল। তৎপরেই এক রহস্যকর ব্যাপার। ঘোড়া রাজাকে সেই প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ে দণ্ডায়মান রাখিয়া আপনি গলিয়া পালাইল; একটু দূরে গিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, রোড্‌স দ্বীপে এক বৃহৎ পাষাণমূর্ত্তি দুই শিলাময় দ্বীপে পাদন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকল যাইতে পারে। রাজার বর্ত্তমান অবস্থায় পুস্ত-

কের কথা মনে পড়িল। একটু হাসি আসিল। রাজাও হাসিয়া বলিলেন, পাহাড়ী ঘোড়ার এই ক্ষুদ্র শরীরে এত দুষ্ট বুদ্ধি!

আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নবাগত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নদী পার হইবার কোন উপায় আছে কি না? তিনি বলিলেন "নৌকা।"

রাজা। নৌকা কোথায়?

সন্ন্যাসী। আসিবে।

রাজা। নৌকা এখন কোথায় আছে? কখন আসিবে বলিতে পারেন?

সন্ন্যাসী শিরশ্চালনে জানাইলেন "আসিবে।"

রাজা। আপনি নিশ্চয় জানেন, এখানে নৌকা আছে? পাটুনির নাম জানেন? আমরা এখানে বিলম্ব করিতে পারি না।

সন্ন্যাসী। ব্যস্ত হওয়া বৃথা।

রাজা। পথে অনর্থক বিলম্ব আমার অসহ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে আমার এইরূপে বিলম্ব ঘটিতেছে।

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন না।

রাজা। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

সন্ন্যাসী। পুরুষোত্তম।

রাজা। কোথায় যাইবেন?

সন্ন্যাসী। হরিদ্বার।

রাজা। আমরাও আপাততঃ হরিদ্বারে যাইতেছি। চলুন, একত্রে যাওয়া যাউক।

সন্ন্যাসী শিরশ্চালনে সম্মতি জানাইলেন।

রাজা। আপনার আশ্রম কোথায়?

সন্ন্যাসী। হরিদ্বার।

রাজা। ভালই হইল—আপনি হরিদ্বারবাসী। আপনি বলিতে পারেন, মহাপ্রস্থান হরিদ্বার হইতে কতদূর?

সন্ন্যাসী। অনেক।

রাজা। আমরা মহাপ্রস্থান যাইতেছি। হরিদ্বার দিয়াই মহাপ্রস্থানের সহজ পথ?

সন্ন্যাসী অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন করিয়া বলিলেন, "যমুনোত্রি দিয়া।"

রাজা। তবে আর আমরা হরিদ্বার যাইব না। আপনি কখন মহাপ্রস্থান গিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। না। শুনিয়াছি।

রাজা। তবে চলুন না, মহাপ্রস্থান দর্শন করিবেন।

সন্ন্যাসী। আপত্তি নাই।

রাজা। আমি সংকল্প করিয়াছি, পাণ্ডবেরা যে পথে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—আমারাও সেই পথে যাইব—

যোগজীবন বলিল, নৌকা আসিতেছে। আমাদের কিয়দ্দূরে যেখানে নদী বাঁকিয়া গিয়াছে—সেই দিকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখা দিল। দেবীপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

নৌকা আসিল। আমাদের ঘোড়াগুলি ও রামটহল সর্ব্বাগ্রে পার হইল। তাহার পর আমরা অপর পারে উপস্থিত হইলাম। মাঝি বলিল, নদীর জল স্থানে স্থানে অত্যন্ত গভীর। দেখিলাম অনেক স্থানে প্রস্তর খণ্ড সকল জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে।

আমরা সকলেই যমুনোত্রির অভিমুখে চলিলাম। নবাগত সন্ন্যাসী ধ্বজাধারী আমাদের পথ প্রদর্শক হইলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গ্রামের মধ্যে এক বৈশ্যের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গৃহস্বামী সাদরে সমাগত উদাসীনদিগকে অভ্যর্থনা করিল; গৃহ মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া দিল। আমরা তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম।

গৃহস্থ পশুপালন ও সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহার অনেক গুলি পুত্রকন্যা। আমরা অগ্নি সেবন করিতেছি, সহসা তাহারা দলে বলে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। নিমেষ মধ্যে কেহ কোলে, কেহ স্কন্ধে, কেহ পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। গৃহস্থ কাষ্ঠ আনিতে গিয়াছিল। সে গৃহে আসিয়া বালকদিগকে তিরস্কার আরম্ভ করিল। বালকদিগকে স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ ত্যাগ করিতে দেখিয়া যোগজীবন চারি পাঁচটি লইয়া কোলে বসাইল এবং তাহাদের সহিত বাল্যখেলায় মন নিবেশ করিল। আমি ও রামটহল প্রত্যেকে দুই একটি লইয়া অগ্নি-সেবনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আহারাদির পর কৃষক রাশীকৃত শুষ্ক তৃণ আনিয়া তাহার উপর কম্বল বিছাইয়া শয্যা প্রস্তত করিল। প্রগাঢ় নিদ্রায় রাত্রি অতিপাতিত করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। বিদায়ের পুর্ব্বে গৃহস্বামীকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলাম, সে কিছুতেই লইতে সম্মত হইল না।

আজি আমি ঘোটকপৃষ্ঠে সকলের অগ্রসর হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই রাম-টহল আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। দুই চারি কথার পর বলিল "গুরুজি, রাজা আমার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; বুঝি মহাপ্রস্থান আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আপনারও সঙ্গ ছাড়িতে হইল।"

আমি। কেন?—রাজা কিছু বলিয়াছেন।

রাম। কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাঁহাব অসন্তোষের চিহ্ন অনেক দেখিয়াছি।

আমি। কিরূপ অন্তোষের চিহ্ন।

রাম। আপনাকে বলিয়া মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা নাই।

আমি। বল—আমার শুভাশুভ নিজের আয়ত্ত।

রাম। কাল যোগজীবনের সহিত রাজার কথা হইতেছিল;—রাজা বলিলেন, রামটহলও হরিচরণকে সঙ্গে আনিয়া ভাল করি নাই। ইহারা স্বর্গ-বাসের যোগ্য নহে। লোভ, হিংসা ও কামে আজিও ইহাদের মন অধিকৃত রহি য়াছে। আমার ইচ্ছা, উহারা কাশীতে ফিরিয়া যাউক।

আমি। তুমি কিরূপে শুনিলে?

রাম। রাত্রিতে আপনারা সকলে শীঘ্র নিদ্রিত হলেন। আমারও অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, এমন সময়ে যোগজীবনের মৃদুস্বর কথায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল।

আমি। কিরূপে কথার সূত্রপাত হ'ল?

রাম। আদি অবধি সব শুনি নাই; তন্দ্রাবস্থায় কি শুনিয়াছিলাম—স্মরণ হইতেছে না। সম্পূর্ণ জাগ্রদবস্থায় শুনিলাম—যোগজীবন বলিতেছে, আমি কৃত্রিম স্নেহ ও অমায়িকতা দেখাইয়া হরিচরণকে ভুলাইয়াছি। আপনি যে আমাকে তাহার অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আপনার উপর তাঁহার পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা আছে। আর আপনি যে গাজিয়াবাদে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারও প্রকৃত কারণ সে বুঝে নাই। রাজা বলিলেন, সেই সময়ে ভাঙ্গিয়া বলিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে অন্ততঃ একের হস্তে নিস্তার পাইতাম।

আমি। তার পর।

রাম। যোগজীবন বলিল, এখন তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া বিদায় করিলেই ত হয়।

আমি বলিলাম, দেখ রামটহল, তোমার কথায় আমার অণুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তোমার স্বভাবের উপরও আমার ঘৃণা আছে। তুমি আর ওরূপ কথা আমাকে বলিও না। তুমি যোগজীবনের উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার অপনয় করিতে পারিবে না।

রামটহল আরক্তনয়নে বলিল "বাস্তবিকই কি আমার চরিত্রে আপনার ঘৃণা আছে? যোগজীবন আমাকে সহস্রবার বলিয়াছিল—আপনি আমার শত্রু। আমি নিতান্ত মূর্খ, তাই আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; আমার সংস্কার ছিল, আপনি পণ্ডিত, মনুষ্যের স্বভাব বুঝিতে পারেন।

আমি। রামটহল, যে ব্যক্তি রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে, এই সে দিন তোমার চক্ষুর উপর যে ব্যক্তি বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি অকাতরে দান করিয়া আসিল, তাহার মনে সামান্য অর্থ-চিন্তা ও তন্নিবন্ধন বিরক্তি ও অবিশ্বাস স্থান পাইবে, বাতুল না হইলে, কেহ এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না।

রাম। গুরুজি, আপনি আমাকে বিশ্বাস না করুন, আর বাতুল বলুন, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই। রাজা আমাকে বিদায় দিলেই বা ক্ষতি কি? তবে অপমান; সে অপমান আপনার ও আমার সমান হইবে। আমি সে অপমান সহ্য করিতে এখন অবধি কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত হইতেছি। আপনার স্কন্ধে তাহা নূতন আসিবে; আমার অপেক্ষা আপনার পক্ষে তাহা অধিক দুঃসহ হইবে; সেই জন্যই আপনাকে পূর্ব্বে একথা বলা। আপনি বুঝিতেছেন না—রাজার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গযাত্রা সুসাধ্য হইবে না। যোগজীবন তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেছে, আমরা পরামর্শ করিয়া তাঁহার সকল অর্থ লইয়া পালাইবার চেষ্টায় আছি। ইহাতে তাঁহার অবিশ্বাস ও বিরক্তি কি বিচিত্র?

আমি। যোগজীনের এরূপ বলায় লাভ কি?

রাম। আপনি এত দিনেও যোগজীবনকে চিনিলেন না—ইহাই বিচিত্র। যোগজীবনের উদ্দেশ্য অনেক। আমরা থাকিতে তাহার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না বলিয়াই, তাহার আমাদিগকে বিদায় দিবার চেষ্টা। যোগজীবন যে ছদ্মবেশী, তাহা কি আপনি জানিতে পারেন নাই? আমি এখনই যোগজীবন কি পদার্থ তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি। কিন্তু আপাততঃ তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার হ্রাস করিবার জন্য যোগজীবন কতবার কত কথাই বলিয়াছে। কিছুতেই আমি কর্ণপাত করি নাই। আপনি অনায়াসে তাহার মোহন মন্ত্রে বশ হইলেন! তবে যোগজীবন চতুর লোক; সে দিন প্রত্যূষে সাহারণপুরে আমায় ডাকিয়া কত কথাই বলিতেছিল; শেষে, বোধ হয়, দ্বারদেশে আপনার পদশব্দ পাইয়া গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আমি উপহাস মনে করিলাম, নিজেও সেই রূপ কথা বলিতে ছিলাম; যদি জানিতে পারিতাম, আপনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন, তখনই তাহার সকল বিদ্যা বাহির করিয়া দিতাম।

আমি বলিলাম, রামটহল, ক্ষান্ত হও; তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

রাম। আমি আর বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। ইহার ফলভোগ

সত্বরই হইবে। তবে আমি আপনাকে ভক্তি করিতাম; একমাত্র হিতৈষী বলিয়া মনে করিতাম। আজি অবধি সে ভাব অন্তরিত হইল। যখন পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, তখনই সংসারে অসহায় হইয়াছি। আমার পক্ষে ইহা নূতন নয়। যে ব্যক্তি বজ্রবেদনা সহিয়াছে, বাণপ্রহার তাহার পক্ষে কিছুমাত্র ক্লেশকর নয়। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজি অবধি আপনাকে আর কোন কথা বলিব না।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমরা বনমধ্যস্থ তপস্বীদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। সেখানে নিশাযাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম।

দেবদারু, আম্র ও অন্যান্য সুরস ফল-বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমাদের পথ। মধ্যে মধ্যে রৌপ্যদ্রবময়ী ক্ষুদ্র নদী সুবর্ণময় বালুকার উপর দিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী অভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় প্রচণ্ড শীত বায়ুর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ সময়েও এখানে বসন্ত বিরাজমান। ফলভরনত বৃক্ষশাখায় পাতার ভিতর লুকাইয়া কোকিল নানা স্বরে শব্দ করিতেছে। কখন এক একটি বিভিন্ন উচ্চ-আলাপ; কখন ধারাবাহী কোমল শব্দস্রোতঃ; কখন মনের উন্মাদক গভীর উচ্চরবের প্রবাহ; যেন এক এক পক্ষীর কণ্ঠের ভিতর অনেক গুলি কোকিল প্রবিষ্ট হইয়া পরে পরে, একে একে, ডাকিতেছে। আমরা স্বচক্ষে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের স্বর্গকল্পনার আদর্শ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পর দিবস আমাদের পথ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর হইয়া আসিল। পথের মধ্যে স্থানে স্থানে নবোদয় শিলাসকল মাটির উপর প্রস্তরময় তালির ন্যায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নিকটেই, পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে, নিবিড় জঙ্গল; আর মধ্যে মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ শস্যক্ষেত্র। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে প্রকৃতির সদানন্দময়ী মূর্ত্তি নয়; কোমল প্রবৃত্তিসমূহের উদ্দীপন, নয়নরঞ্জন মূর্ত্তি নয়। তরুণের নববিভাসমান, যুবার পূর্ণ, চঞ্চল, তেজস্বিনী অনুভূতি

সমূহের পোষণ দ্রব্য এখানে অধিক নাই। এ স্থান প্রবীণের শান্তি ও ভক্তির উদ্দীপন; কবির কল্পনা, তত্ত্বদর্শীর চিন্তা, ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক ভাবনার উপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের উজ্জ্বল রত্ন মহর্ষিগণ ইহা দেখিয়াছিলেন; তাহাতেই উন্মত্তচিত্তে সর্ব্বত্যাগী হইয়া, গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী ও কৃষ্ণার তীরবর্ত্তী স্বর্ণক্ষেত্রসমূহের মায়া ছাড়িয়া এই হিমমণ্ডিত শিখরীর আশ্রয়ে, পরোপকারব্রতে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। অমরতার্থী নরপতিদিগের ন্যায় হিমালয় সাদরে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া ত্রিভুবনে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

যোগজীবন আজি সকলের পশ্চাতে পড়িল। কয়েক দিন উপর্য্যুপরি সে ক্রমাগত চলিতেছে। আবার এরূপ পথে চলা তাহার নিতান্ত অনভ্যাস। তাহার পর গত রাত্রিতে তুষারপাত হইয়াছিল; যোগজীবন প্রাতঃকালে শূন্যপদে তাহার উপর চলিয়াছে। দক্ষ পর্য্যটক মনুষ্যপুত্তলী ধ্বজাধারী সমপাদবিক্ষেপে চলিতেছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নাই, পাদবিক্ষেপের লঘুতা ও দীর্ঘতা নাই, পর্য্যটনে ক্লান্তি বোধ নাই; সুতরাং যোগজীবন তাঁহারও অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে দেখিয়া আমাদিগকে পথের মধ্যে অনেক বার অপেক্ষা করিতে হইল। অপরাহ্নে আমি পথের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রি যাপনের প্রস্তাব করিলাম। ধ্বজাধারী বলিলেন, "প্রাতঃকালে নন্দিয়া গ্রামে বিশ্রামের কথা হয়।" আমি বলিলাম—আজি আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়াছি; বিশেষতঃ যোগজীবন বোধ হয় আজি আর চলিতে পারিবে না।

ধ্বজা। সংকল্প-ব্যাঘাত।

আমি। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? এ গ্রামে থাকিবার যোগ্য স্থান পাওয়া যাইবে না?

ধ্বজাধারী মস্তক এক পার্শ্বে একটু হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

আমি। তবে আজি এই গ্রামেই থাকা যাউক।

ধ্বজাধারী ধীরে ধীরে উভয় পার্শ্বে একটু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, তাহা হইবে না।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, স্বর্গযাত্রার পথে বিলম্ব অনাবশ্যক। বরং আরও মন্দগতিতে যোগজীবনকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাউক।

ধ্বজাধারীর গতিনিবৃত্তি নাই। তিনি সমবেগে চলিতেছিলেন। আমরা মৃদুপদে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

সন্ধ্যার পর ধ্বজাধারী নন্দিয়াগ্রামের প্রান্তস্থিত, গৌরীনদীর তীরবর্ত্তী, অরণ্যে তাপসদিগের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি আশ্রমে বিলক্ষণ পরিচিত। প্রতি বৎসর যমুনোত্রি যাইবার সময় এখানে আসিয়া দুই এক দিন অবস্থান করেন। আশ্রমবাসী তপস্বিগণ সোল্লাসে আমাদিগের আতিথ্য করিলেন। পরদিন উঠিতে বেলা হইল। তখনও আমাদের প্রস্থানোদ্যোগ হয় নাই। বাহিরে আসিয়া রাজা ও রামটহলকে বৃক্ষমূলে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত দেখিলাম।

রাজা বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, স্বর্গযাত্রার প্রথমেই এই ব্যাঘাত ; শেষে কি হয়, বলা যায় না।

আমি ব্যাঘাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা বলিলেন, যোগজীবন পরিশ্রম-জনিত বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে; চলিবার সামর্থ্য নাই। এখন অবধিই পথে এইরূপ বিলম্ব হইতে লাগিল!

রামটহল বলিল—যোগজীবনের পাপ আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ; সেই জন্য স্বর্গগমনপথে সর্ব্বপ্রথম তাহার পতন হইল। তবে বলিতে পারিনা; এই প্রমাণসত্ত্বেও আপনি আমার কথায় কাজ করিবেন কি না। রাজা যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত স্বর্গযাত্রা করেন ; তাঁহারা সকলেই একে একে ভূতলশায়ী হন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখ না চাহিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই শেষে সশরীরে স্বর্গারোহণে কৃতকার্য্য হন। যোগজীবনের ভাগ্যে স্বর্গ নাই। দেবতারা সকলে মহারাজের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিতেছেন ; তাঁহারা মনুষ্যের পাপ পুণ্য সমস্তই দেখিতে পান।

রাজা। যোগজীবনের শরীরে অধিক পাপ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

রাম। আমাকে ও গুরুজিকে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী বলিয়া আপনার স্থির বিশ্বাস আছে; সুতরাং এই পরিচয়েও আপনার মন পরিবর্ত্ত হইবে, তাহা সম্ভব

নয়। যাহাই হউক আমরা আপনার অন্নে পালিত; ভৃত্যের কার্য্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার পরামর্শ এই, যোগজীবনকে কিছু অর্থ দিয়া ও তাহাকে কাশীতে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া আপনার স্বর্গের পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত; পথে এরূপে বিলম্ব করা শুভকর নহে। এ বিষয়ে গুরুজির মত কি?

আমি রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আপনি বোধহয় যোগজীবনকে ত্যাগ করিবেন না; যদিই তাহাতে কৃতসংকল্প হন, আমাকেও ত্যাগ করিবেন; আপনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে যাত্রা করুন। রাজা বলিলেন, হরিচরণ,তুমিত জান, যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের জন্য নরক ভোগেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরের যাদৃশ প্রিয় ছিলেন, তাহা অপেক্ষাও তোমরা আমার প্রিয়। তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও সুখী হইতে পারিব না।

যোগজীবন যথার্থই নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। আমি তাহার আবশ্যক শুশ্রূষা করিতে চাহিলাম। যোগজীবন বলিল, শুশ্রূষার আবশ্যক নাই। আমার অনুরোধ, আমাকে নির্জ্জনে একাকী থাকিতে দেও। আর রামটহলকে নিষেধ কর, যেন আমার গৃহে না আইসে।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে রামটহল বলিল, গুরুজি, যোগজীবনের মন্ত্রণার কিছু আভাস পেলেন?

আমি। মন্ত্রণা কিছুই দেখিতে পাই না।

রাম। রাজা যে আমাদিগকে নিতান্ত অধার্ম্মিক ও স্বার্থপর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কথার প্রণালীতে তাহা বুঝিলেন না? তাঁহার শেষ কথাগুলি যে স্তোভ বাক্য, তাহাও আপনার মনে হল না?

আমি। না।

রাম। তবে নিতান্তই আমার অদৃষ্টের দোষ।

রামটহল ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া গেল। আমি রামটহলের এরূপ চাতুরীর কোন

অভিপ্রায় আছে কিনা ভাবিতে লাগিলাম, কিছুই উপলব্ধি হইল না। তাহার পর আর তিন দিন যোগজীবন শয্যাগত ছিল। এই তিন দিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

তৃতীয় দিবস সায়ংকালে যোগজীবন আমার নিকট আসিয়া বলিল, গুরুজি, আপনার নিকট রাজার যে নোট ও মোহর আছে, আমাকে দিন্।

আমি একটু বিরক্ত হইলাম। যোগজীবন বলিল—রাজার নিকট যে টাকা ছিল, তাহাও আমাকে দিয়াছেন। টাকা একের হস্তেই থাকা ভাল।

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া নোট ও মোহর বাহির করিয়া দিলাম। এক সন্ন্যাসী অগ্নি সেবনার্থ আমাকে ডাকিতে ছিলেন, ত্বরিতপদে তাঁহার পার্শ্ব বর্ত্তী হইলাম।

রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। শয্যায় বিনিদ্র অবস্থায় শয়ান থাকা শেষে কষ্টকর বোধ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় শয্যাগৃহ ত্যাগ করিয়া, শীত বাত তুচ্ছ করিয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ কমিল। আমি পুনর্ব্বার শয়ন করিতে যাইতেছি, যোগজীবনের গৃহে রামটহলের কথার শব্দ পাইয়া, দাঁড়াইলাম। রামটহল বলিল, তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিয়াছি; তোমার কথায় প্রত্যয় হয় না।

যোগজীবন বলিল, এই দেখ—রাজা ও হরিচরণের নিকট কৌশলে সকল টাকা বাহির করিয়া লইয়াছি। কিন্তু যতদিন ইহাদের হস্ত হইতে আমাকে নিরাপদ করিতে না পারিবে, ততদিন তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে না। ইহা আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

রাম। চল এই রাত্রিতে, এখনই পলায়ন করি।

যোগ। ক্ষতি কি।

রামটহল উঠিল; দ্বারের নিকট আসিতেছে, যোগজীবন ডাকিয়া বলিল, দেখ রামটহল, আমি বলি, এখান হইতে পালাইয়া কাজ নাই। তাহা হইলে ধরা পড়িব। চল আরও দুই চারি দিন ইহাদের সঙ্গে যাই; রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করি। তাহার পর একদিন পথ হইতে পালাইব। ইহারা মনে করিবে—আমারা পশ্চাতে পড়িয়াছি; তাহার পর রাত্রিতে যখন জানিতে

পারিবে, তখন আর আমাদের অনুসরণ চলিবে না। প্রাতঃকালের পূর্ব্বে আমরা অনেকদূর যাইব।

রামটহল বলিল, সে পরামর্শ মন্দ নয়। আর কিয়দ্দূর গেলে লোকজন ও থানাদারের হাতও অতিক্রম করিতে পারিব।

আমি আর দাঁড়াইলাম না। এতদিনের পর বুঝিলাম, রামটহলের ন্যায় যোগজীবনেরও অনন্ত লীলা।

প্রাতঃকালে যোগজীবনের "গুরুজি" শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি কর্কশ-স্বরে বলিলাম "কি ?"

"আপনার সহিত একটা কথা আছে।"

আমি উত্তর করিলাম না। শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। যোগজীবন আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। আমি পাদচারে আশ্রমসীমা ত্যাগ করিলাম; সেখানে ফিরিয়া দেখি—পশ্চাতে যোগজীবন; দ্রুতপদে অনতিদূরবর্ত্তী শৈলের নিকট গেলাম, আবার পশ্চাতে যোগজীবন। আরও দ্রুতপদে পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম; বহুদূর ঊর্দ্ধধাবনে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া আবার পশ্চাতে দেখি, যোগজীবন। একটু দূরে জঙ্গল ছিল; ভিতরে প্রবিষ্ট হইলাম, বৃক্ষাবলির ভিতর দিয়া, লতাবিতান ভেদ করিয়া বেগে ধাবিত হইলাম—তথাপি পশ্চাতে যোগজীবন। বলিলাম "কি চাও ? হিংস্রশ্বাপদ অপেক্ষা তোমাকে আমি অধিক ভয় করি।"

যোগ। আমি কি অপরাধ করিলাম।

আমি। অপরাধ কিছুই নয়; আমাকে একটি ভিক্ষা দাও—আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

যোগ। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাতে অন্তরায় হইতে চাহি না। কেবল জানিতে চাই, আজ এ ভাব কেন ?

আমি। বিলক্ষণ জানিয়াছি, তুমি কি উপাদানে নির্ম্মিত।

যোগ। তাহা যদি জানিতেন তাহা হইলে আজি এরূপে অরণ্যে অরণ্যে ভিখারীর ন্যায় বেড়াইতে হইত না।

আমি। আমি জানিয়াছি, বিচিত্র সুন্দরমূর্ত্তি সর্প সংহারক বিষে পূর্ণ।

যোগ। কোথায় কিরূপে জানিলেন?

আমি। কালি রাত্রিতে, তোমার গৃহদ্বারে।

যোগ। আমার কৌশলে আপনার ও রাজার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

আমি। তোমার প্রদত্ত জীবন কুক্কুরের জীবন অপেক্ষাও অপবিত্র। তোমার অনুগ্রহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণ সহস্রগুণে ভাল। আমি আর তোমার মোহন মন্ত্রে ভুলিব না; আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি, আর আমার সম্মুখে আসিও না। আর তোমার মুখদর্শন করিব না।

আমি জঙ্গলের বাহির হইবার জন্য দ্রুতবেগে চলিলাম। অমনি যোগজীবন আমার বস্ত্রাঞ্চল ধরিল; বলিল, গুরুজি, যদিই অপরাধী হই—ক্ষমা করুন।

আমি ক্রোধভরে বলিলাম, পাষণ্ড নরশার্দ্দূল, পরামর্শ করিয়া বনমধ্যে আমার জীবনগ্রহণের সংকল্প করিয়াছ;—দুষ্কর্ম্মসহায়দিগের অপেক্ষায় আমার পথরোধ করিয়াছ—

যোগজীবন আমার পদতলে পড়িয়া বলিল—যত ইচ্ছা তিরস্কার করুন, ও কথা বলিবেন না—আপনি জানেন না, আমার জীবন অপেক্ষা আপনার জীবন আমার কত প্রিয়।

আমি সবলে পা ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলাম।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের আশ্রমবাসের দ্বিতীয় দিবসে শম্ভুজি নামে এক মহান্ত হরিদ্বার হইতে এখানে আসিয়াছিল। তাহার সহিত রামটহলের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। উভয়ে সর্ব্বদাই গোপনে পরামর্শ করিত, দেখিতে পাইতাম। আজি পর্ব্বতের উপর হইতে নামিতে যাইতেছি, দেখি—রামটহল ও শম্ভুজি অন্য পার্শ্ব দিয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। দেখিয়াই মনে হইল—ইহাদের অপেক্ষায়ই যোগজীবন আমার পথরোধের প্রয়াস পাইয়াছিল।

পশ্চাতে চাহিয়া যোগজীবনকে দেখিতে পাইলাম না। অলক্ষ্যভাবে রামটহল ও শম্ভুজির গন্তব্য পথের পার্শ্বে গিয়া বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলাম; তাহার পর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া নিবিড়-লতাবিতান মধ্যে যেখানে তাহারা বসিল, তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলাম। রামটহল বলিল,—"সুতরাং তোমাকে আর এই সাহসীক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল না। যে জন্য কাশীত্যাগ করিয়া এতদূর আসা, তাহাও সিদ্ধ হ'ল। যখন কাশীতে ছিলাম, মনে করিতাম, রাজার সম্পত্তি আমারই। মধ্যে কোথা হইতে এই স্বর্গযাত্রার প্রস্তাব আসিয়া আমাকে একরূপ সকল আশায় বঞ্চিত করে ছিল।"

শম্ভু। তুমি কাশীতে থাকিলে রাজা কি তোমায় কিছু দিত না?

রাম। কিছুতে আমার মন উঠে না। যাহাই হউক উপরি অঙ্কে আমার যে লাভটা হয়ে গেল, কাশীতে থাকিলে তা হত না।

শম্ভু। কি উপরি লাভ?

রাম। স্ত্রীরত্নং মহাধনম্।

শম্ভু। কোথায় মিলিল?

রাম। এই হিমালয়ের উপব; বনের মধ্যে।

শম্ভু। কোথায় রাখিলে?

রাম। মুষ্টিব ভিতর। ভাইরে, কেবল টাকার জন্য এত দূর আসা রাম-টহল শর্ম্মার আবশ্যক হয় না। কেবল সেই লোভেই এই পরিশ্রম। সেই জন্য এই পথের মধ্যে কত খেলাই খেলিয়াছি, কিছুই সফল হয় নাই। শেষে কাল রাত্রিতে পাখী আপনা হতে ধরা দিল।

শম্ভু। কি রকম খেলা খেলে ছিলে?

রাম। পাখীটি আর একজনের পোষ মানা। একবার পাখীকে তাহার পোষকের হাত থেকে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলাম; চেষ্টা বিফল হইল। তার পর দেখিলাম—পোষককে কোন মতে দূর করিতে পারি কি না; তার পর মনে করিলাম, দোষ দেখাইয়া পাখীর উপর পোষকের মন চটাইয়া দিব। সে বিরক্ত হয়ে পাখী ছাড়িয়া দিবে, আমি অমনি ধরিব—

শম্ভু। আমি ভাই তোমার ও সব সঙ্কেত কথা বুঝি না; স্পষ্ট কথা বল।

রাম। স্পষ্ট বলিব না। আমি কেবল আপনার বুদ্ধিবল ও পরিশ্রমের পরিচয় দিলাম।

শম্ভু। ও পরিচয়ে আমার কাজ নাই; আমার টাকা দাও।

রাম। কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া গেলেই দিব। তুমি তাহাতে নিশ্চিন্ত থাক।

রামটহল উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি মৃদুপদে অন্য পথ দিয়া আশ্রমে আসিলাম। রাজাকে এ সকল কথা বলা আপাততঃ আবশ্যক মনে হইল না।

পর দিবস প্রত্যূষে আমরা পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। ধ্বজাধারী বলিলেন, হরিচরণ, কিয়ৎক্ষণ পাদচারে আমার সঙ্গে এস।

অনেকদুর আসিয়া বলিলেন "যোগজীবনের অপরাধ নাই।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কি অপরাধ?"

ধ্বজাধারী। সব শুনিয়াছি।

আমি। আপনি কিরূপে জানিলেন "অপরাধ নাই।"

ধ্বজা। বলিতে বাধা আছে।

আমি। আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব।

ধ্বজা। আমার কথা।

আমি। আপনার ভ্রম হইবারই সম্ভবনা অধিক।

ধ্বজা। না; বিশ্বাস কর।

আমি। আপনি বুঝি রামটহলের কুহকে ভুলিয়াছেন।

ধ্বজা। জানি—রামটহল তোমার শত্রু।

আমি। আর যোগজীবন?

ধ্বজা। পরম মিত্র।

আমি। কিরূপে বুঝিব।

ধ্বজা। কথায় বিশ্বাস কর, নতুবা পাতকী হইবে, দুঃখ পাইবে।

আমি উত্তর করিলাম না।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে যোগজীবনের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম—যোগজীবন, তোমার প্রতি আমার কালিকার আচরণ কি অন্যায় হইয়াছে?

যোগ। আমি কি বলিব; আপনার ন্যায়ান্যায় মনুষ্য-সমাজ-প্রচলিত ন্যায়ান্যায় হইতে পৃথক্।

আমি। কিসে?

যোগ। অদ্যাবধি যে সকল কাজ করিয়াছেন, মনুষ্য সমাজের ধর্ম্মবিধি অনুসারে বিচার করুন্, বুঝিবেন।

আমি। সে রাত্রির কথাগুলির মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

যোগ। সে প্রত্যাশা রাখি না। আর কথাগুলির মর্ম্ম বুঝাইবার উপযুক্ত সময় এখন নয়। তদ্ভিন্ন সকল কথা না বলিলে যদি আমাকে ক্ষমা করিতে না পারেন, ক্ষমা করিয়াও কাজ নাই।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সে দিবস আমরা পথিমধ্যে পর্ব্বত-গহ্বরে রাত্রিযাপন করিলাম। ধ্বজাধারী নিশাচর শ্বাপদদিগের আক্রমণ নিবারণমানসে গুহার সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। আমরা স্থির করিলাম, সকলেই বসিয়া রাত্রি কাটাইব। কিন্তু একটু অধিক রাত্রি হইলেই আমি সর্ব্বাগ্রে শয়ন করিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, সকলেই ঘুমাইতেছে, কেবল ধ্বজাধারী একাকী বিনিদ্র বসিয়া আছেন। ধ্বজাধারীর মুখে শুনিলাম, রাত্রিতে অনেকবার সিংহ ও ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল।

প্রভাত হইবামাত্র আমরা এই ভয়ানক স্থান ত্যাগ করিলাম। আমাদের বাহন অশ্বেরা পর্ব্বতারোহণের কৌশল ও চতুরতায় সকলকে চমৎকৃত করিল। আমরা পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতেছি; স্থানে স্থানে পথ এক হাত অপেক্ষাও অল্পপরিসর। তাহার দুই পার্শ্বে ভয়ানক গভীর গহ্বর—তখনও অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত-শিখরে প্রতিফলিত আলোকে গহ্বরের ভিতর দেখা গেল। আমার হৃৎকম্প হইল;—এই ক্ষুদ্র পথের প্রান্তে, ঠিক নীচে, প্রায়

একশত হাত গভীর গহ্বর। আমি ঘূর্ণিত-মস্তকে দুই তিন বার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম।

অশ্বেরা এই সংকীর্ণ, বন্ধুর পথ দিয়া অনায়াসে চলিতে লাগিল। একবারও তাহাদের পদস্খলিত হইল না। পদব্রজে যাইতে হইলে আমি তখনি গহ্বরের ভিতর পড়িয়া শরীর চূর্ণ করিতাম, পর্ব্বতের ধূলার সহিত মিশাইয়া যাইতাম।

ধ্বজাধারী যোগজীবনের অবলম্বন-যষ্টি-স্বরূপ হইয়া এই পথ দিয়া অনায়াসে যাইতেছেন। তখন রৌদ্রে পার্ব্বতীয় তুষার গলিতে ছিল; তাহার উপর দিয়া শূন্যপদে চলিতেছেন। কিন্তু অন্যদিনের ন্যায় আজি আর তাঁহার সমপাদক্ষেপ নাই। প্রতি পদে যোগজীবন তাঁহার গতিরোধ করিতেছে। তাঁহারা উভয়ে আজি সকলের পশ্চাতে অনেক দূরে পড়িয়াছেন।

অনেকক্ষণের পর দাঁড়াইবার একটু স্থান পাইয়া আমরা পশ্চাতে চাহিলাম। ধ্বজাধারী ও যোগজীবন অদৃশ্য। পরক্ষণেই দেখি, তাঁহারা আমাদের ঠিক নীচে আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদের প্রায় বিশ হস্ত উপরে আছি। সেইখানে দাঁড়াইয়া দুই একটি কথা কহিয়া তাঁহারা আবার অদৃশ্য হইলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টার পর তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রাতঃকালের ন্যায় এখন আর শীত নাই। এখানে শীতোষ্ণের এরূপ বিশৃঙ্খলা যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেশের ভয়ানক শীত ও মধ্যদেশের বিষম গ্রীষ্ম—উভয়ই অনুভূত হয়।

রামটহল আমার নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিল, দেখ গুরুজি, স্বর্গে সকল ঋতু সর্ব্বদা বর্ত্তমান বলিয়া যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাহার অর্থ বোধ হইল; অর্থাৎ রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে শীত, মধ্য দিবসে বসন্ত, অপরাহ্নে গ্রীষ্ম, সন্ধ্যার সময় হেমন্ত, তাহার পর আবার শীত—এইরূপে সকল ঋতু প্রতিদিন আবির্ভূত হয়। বলুন দেখি—ইহা কি সুখকর? আমারত ইহাতে ক্লেশ বোধ হয়।

আমি উত্তর করিলাম না। দেবীপ্রসাদ নিকটেই ছিলেন। তিনি বলিলেন স্বর্গে এখানকার মত নয়। সেখানে সকল ঋতু একেবারে, এক সময়ে,

একত্র প্রকাশমান। সেখানে বসন্তের পুষ্প, গ্রীষ্মের ফল ও শীতের পানীয় সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

রাম। এখানেও তাঁহার অভাব নাই—দেখিতেছেন, সকল সময়ের ফল ও সকল সময়ের ফুল সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবী। থাকাও আবশ্যক। হিমালয় পৃথিবীতে দেবতাদিগের বিহার-ভূমি, বিশেষতঃ স্বর্গের পথ।

নানাবিধ সুস্বাদ ফলে সেইখানে আমাদের দিবা-ভোজন সম্পন্ন হইল। ভোজন করিতে করিতে রামটহল মৃদুস্বরে বলিল—এই সকল অমৃত-রস ফল ঈশ্বরের অবিচারে এই নির্জ্জন স্থানে জন্মিয়া আপনা হইতে নষ্ট হইতেছে। মহান্ত, পণ্ডিত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফলাহার-প্রিয়েরা যাহা চক্ষে দেখিতেও পান না, বনের পশু পক্ষীরা তাহা মনের সাধে অজস্র ভোজন করিতেছে; ইহা বড় পরিতাপের বিষয়। শম্ভুজি বলিল—ঈশ্বরের অবিচার নয়। ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধির অগৌরব করিয়া পুরী ও মিঠাই ভোজনে ফলাহার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বশিল্পীর স্বহস্ত-নির্ম্মিত ফল সকলের অপমান করা হইয়াছে; ইহাও মার্জ্জনীয়; বাঙ্গালি ও উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা মুড়ি ও চিড়াতেও ঐ মনোমোহন শব্দ আরোপ করিয়া তাহার পবিত্রতা একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই পাপে বিশ্বমাতার শাপে তাঁহারা এই সকল ফল ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন।

রাজা ও ধ্বজাধারী দিবা ভোজন করিতেন না। আমরা আহারে প্রবৃত্ত হইলাম দেখিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমিও তাহার অতি অল্প ক্ষণ পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া যাত্রা করিলাম। যোগজীবনও আমার অনুবর্ত্তী হইল।

সন্ধ্যার সময় আমরা দেবগঞ্জ নামে এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামের প্রান্তে এক দোকান ছিল। দোকানদার আমাদিগকে প্রথমে স্থান দিতে অস্বীকার করিল; শেষে অনেক মূল্য স্বীকার ও অনেক অনুনয়ে রন্ধনাদির জন্য বেদীর ন্যায় খোলা একটুকু স্থান দেখাইয়া দিল। আমরা আগুন জ্বালিয়া শরীর উত্তপ্ত করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর শয়নের স্থান চাহিলে দোকানি বলিল, মিলিবে না। অনেক দুষ্ট লোক অনেকবার তাহাকে ঠকাইয়াছে; দুই তিন বার তাহার কোন কোন দ্রব্যও অপহরণ করিয়া পালাইয়াছে। আমরা তাহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম, শেষে তাহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তাহার নিকট কিছু টাকা রাখিয়া দিতেও স্বীকার করিলাম। তাহাতে বিপরীত ফল হইল, সন্দিগ্ধের মনে সন্দেহ আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল।

তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল। সে সময়ে গ্রামে আর কোথাও স্থান পাওয়া অসম্ভব বুঝিয়া আমরা বাহিরে থাকিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। তখন তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা কয়েকটি বৃক্ষে চন্দ্রাতপের ন্যায় করিয়া বস্ত্র বাঁধিলাম ও তাহার চারি পার্শ্বে বস্ত্র ঝুলাইয়া গৃহের মত করিলাম। তাহার ভিতরে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইল। আমরা তাহার চারি পার্শ্বে সুখাসীন হইলাম। দেবীপ্রসাদ বলিলেন—রামটহল, এই মাত্র যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমি বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তুমি অতি পাষণ্ড, অতি নীচপ্রকৃতি। তুমি আমার অন্নে পালিত হয়ে সামান্য টাকার লোভে আমরাই প্রাণসংহারে সংকল্প করেছিলে; কেবল যোগজীবনের বুদ্ধিবলে নিস্তার পাইয়াছি। আমি স্বর্গ-যাত্রায় বাহির হইয়াছি, এ সময়ে তোমাকে দণ্ডিত করে আত্মাকে কলুষিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি টাকার দাস। টাকা দিতেছি, লইয়া পলায়ন কর; কাশীতে গিয়া বাস কর। আর তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।

রামটহল কাঁদিয়া ভাসাইল; বলিল, মহারাজ, আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। সকলে চক্রান্ত করিয়া আমাকে রাজসেবা-সুখে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ ত কাশীতে আমাকে এত অবিশ্বাস করিতেন না; আমিও নিশ্চয় জানি, জ্ঞানপূর্ব্বক কখন অবিশ্বাসের কাজ করি নাই। আমি যদি অর্থের দাস হইতাম, তবে কখনই কাশী ছাড়িয়া আসিতাম না। মহারাজ সকলকে কত টাকা দান করিয়া আসিলেন, আমাকে কি বঞ্চিত করিয়া আসিতেন?

রাজা। কাশীতে তুমি কখন কোন অবিশ্বাসের কাজ কর নাই, তাহা আমি জানি; পথে আসিয়া সহসা তোমার এরূপ বিকৃতি হইল কেন?

রাম। মহারাজ, কাশীতে আমি যে রামটহল ছিলাম, এখানেও সেই রামটহল আছি; শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে সেখানে চক্রান্তকারি-দলের অভাব ছিল। তাহাদের কথায় যদি মহারাজ নিতান্তই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জানিলাম, স্বর্গসুখ-লাভ আমার অদৃষ্টে নাই। স্বর্গ লাভের অনেক বিঘ্ন; ইহা তাহার অন্যতর। আমি কাশীতেও যাইব না। দেখিতেছি, হিমালয়ের শীতল গুহায় প্রাণ-বিয়োগ আমার অদৃষ্ট-লিপি।

রাজা। যোগজীবন কি বল।

যোগ। আমার কথা ধ্বজাধারীকে বলিয়াছি, আপনিও বোধ হয় তাঁহার নিকট শুনিয়াছেন।

রাজা। ভাল এখন অবধি তোমাদের কার্য্য দেখিব, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে কে দোষী।

আমরা সকলেই শয়ন করিলাম; পরিশ্রান্তদিগের তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া একে একে সকলেরই চৈতন্য হরণ করিল। ধ্বজাধারী আমাদের বস্ত্র-গৃহ-মধ্যস্থ অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শীতে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া বসিলাম, দেখি যোগজীবন স্থির ভাবে বসিয়া আছে। নির্জ্জনস্থানে একাকী শয়ন করা তাহার অভ্যাস।

আমি বলিলাম, যোগজীবন, আমি না বুঝিয়া তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিয়াছি, ক্ষমা করিবে?

যোগ। আমি আপনাকে অনেক দিন অবধি জানি।

আমি। আমি অপরাধী, কিন্তু কখন তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।

যোগ। এ বিষয়ে আপনার দোষ নাই। ওরূপ অবস্থায়, ওরূপ কথায় সকলেরই মন বিকৃত হয়। আমি আপনার নিকটেই আত্মপরিচয় দিই নাই; এখনও দিব না। কিন্তু আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ধ্বজাধারীর নিকট পরিচয় দিতে হইয়াছে। পরিচয় দিতে আমার মনে যে আঘাত লাগিয়াছে, আপনি তাহা এখন বুঝিবেন না। যাহাই হউক এখন আমার এক অনুরোধ

আছে, রামটহলের উপর জাতক্রোধ থাকিবেন না। ক্ষমা ঐশ্বরিক; বরং তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করুন।

যোগজীবন ক্ষমার প্রশংসা আরম্ভ করিল। আমি মুগ্ধ হইয়া শেষে ক্রোধ বিসর্জ্জন দিব বলিয়া স্বীকার করিলাম।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে লম্বমান বস্ত্রখণ্ড সকলের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক আমার চক্ষে পড়িল, আমি চাঁদ দেখিতে লাগিলাম; যোগজীবন বলিল, কি দেখিতেছেন?

আমি। চাঁদ।

যোগ। এই ভয়ানক স্থানে, ভয়ানক সময়ে, এই ক্লেশে আবার চাঁদ দেখিবার এত সাধ কেন?

আমি। চিরকালই আমি চাঁদ দেখিতে ভাল বাসি।

যোগ। তবে সন্ন্যাসী হইয়াছেন কেন?

আমি। তাহাতে ক্ষতি কি?

যোগ। চাঁদ প্রণয়ীদেরই সুখবর্দ্ধন; চাঁদ দেখিতে যখন আপনার এত সাধ, তখন আপনি নিশ্চয়ই প্রণয়ের দাস। আপনার প্রীতি এখনও মনুষ্যের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে।

আমি। চাঁদ কেবল প্রণয়িদিগেরর সুখবর্দ্ধন কে বলিল?

যোগ। সকলেই ত বলে; প্রেমিক পুরুষ প্রণয়-প্রসঙ্গে আপনার প্রিয়তমার সহিত চাঁদ দেখিতে ভাল বাসেন; প্রেমপূর্ণ-মনে প্রণয়িণীর প্রফুল্ল মুখ পৃথিবীর সারাৎসার মনে করে, সকল সৌন্দর্য্যের আধার চন্দ্রের সহিত তুলনা দেন। আদর করে প্রাণপ্রিয়ার শ্রীমুখ 'চন্দ্রানন' বলেন; আবার যখন প্রিয়তমা সোহাগ গণিয়া চাঁদ ধরিয়া দিতে অনুরোধ করেন, তখন তাঁহার মুখচন্দ্র

ধরিয়া বলেন; আকাশের কলঙ্কী চাঁদ কেন—এই যে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ ধরিয়া দিতেছি।

আমি। হাসিয়া বলিলাম, তুমি প্রণয়শাস্ত্রে বেশ পণ্ডিত। তুমি আবার আমাকে বলিতেছিলে, আমি প্রণয়ের দাস?

যোগ। তবে চাঁদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কেন?

আমি। দেখিতে ছিলাম,—শৈশবে চাঁদ আয় বলিয়া হাত বাড়াইয়া যে চাঁদ ডাকিতাম; কৌমারে বাগানের ঘাটে বসিয়া যে চাঁদ দেখিতাম, নীল আকাশের কোলে, নীল জলের কোলে বসিয়া যে চাঁদ আমার দিকে চাহিয়া হাসিত; গ্রীষ্মকালে নিশা-ভ্রমণের সময় যখন দক্ষিণ-বায়ুর তরঙ্গ মুখে লাগিয়া মনের উল্লাস বাড়াইত, তখন যে চাঁদ ছোট ছোট ক্ষীণ মেঘখণ্ডের উপর দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিত, এ সে চাঁদ নয়। বঙ্গদেশে যে চাঁদ উঠে, আমাদের গ্রামে, আমাদের বাটীর ছাদের উপর আলো ছড়ায়, তাহার মূর্ত্তি আরও প্রসন্ন, আরও মধুর।

যোগ। আপনার কি এখনও বাটীর কথা মনে হয়?

আমি। তোমারও বাটী ঘর ছিল, তোমার কি মনে হয় না?

যোগ। আমি আমার উপাস্য দেবতার অনুসরণে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়াছি; সে সকল চিরপরিচিত বস্তুর মায়া একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি; এখন আর সে সকল কথা আমার মনে স্থান পায় না।

আমি। যোগজীবন, আমি এখনও তোমার মত চিত্ত সংযম করিতে পারি নাই। কখন পারিব—তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমি নিতান্ত পাপী।

যোগ। মনে যদি এরূপ ধারণা থাকে, তবে ঘরে ফিরিয়া যান না কেন?

আমি। তাহাও কখন যাইব না।

যোগ। কেন?

আমি। বাটীতে গেলে যাহাকে কখন ভাল বাসিতে পারিব না, তাহাকে দেখিতে হইবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যোগ। সে কে?

আমি। পিতা তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছেন।

যোগ। তাহাকে ভাল বাসিতে পারেন না কেন? তার কি দোষ?

আমি। তার এই দোষ, সে আমার চক্ষের বিষ।

যোগজীবন নীরব হইল; আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম।

রাত্রির সহিত শীত বাড়িতে লাগিল। যোগজীবন উঠিয়া অগ্নি জ্বালিল। আগুনের শিখা উপরে উঠিয়া আমাদের বস্ত্রময় গৃহের উপরে সঞ্চিত তুষার গলাইয়া দিল। দুই চারি বিন্দু করিয়া জল পড়িয়া সকলকেই বিনিদ্র করিল। সকলেই কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। আমরা অগ্নি সেবন করিতেছি, বাহিরে মানুষের পদশব্দের ন্যায় শব্দ শুনা গেল—যেন কেহ দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে। এই গভীর রাত্রিতে, এই দুর্দান্ত শীতের সময় মানুষের দ্রুতপাদবিক্ষেপে আমরা একটু চকিত ও উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। যোগজীবন বলিল "বোধ হয় দুষ্ট লোক।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, দুষ্টলোক এমন সময়ে এখানে আসিবে কেন? আমরা সন্ন্যাসী। বোধ হয়, কোন জন্তু।

ধ্বজাধারী মস্তক নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। আবার পদশব্দ। বোধ হইলযেন কেহ তুষারের উপর দিয়া মৃদুপদে আমাদের দিকে আসিতেছে। মনুষ্যের পদশব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামটহল বলিল—রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত লোক এখন শীতের ভয়ে জড় সড় হইয়া গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চোর ডাকাইতদিগের অসদভিপ্রায় সাধনের এই সময়।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, "আমাদের বস্ত্রের কাণ্ডারের নিকটেই বোধ হয় লোক আসিয়াছে।"

রাজার অনুমান সত্য। যেন দুই খণ্ড বস্ত্রের মধ্য দিয়া কেহ দেখিতেছে। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যোগজীবন বলিল "আপনি কোথায় যান?"

আমি। বাহির হইয়া দেখি।

যোগ। একাকী এ সাহসের কাজ করিবেন না; যদিই দস্যু হয়, তবে কখনই তাহারা দুই এক জন আসে নাই।

শম্ভুজি উঠিয়া বলিল, এস রামটহল, বাহিরে দেখা যাক ; বসে গল্প করে কি হবে ?

রাম। তুমি চল না—আমি যাইতেছি।

শম্ভু। তোমার এত ভয়।

রাম। আমি যমকেও ভয় করি না। তুমি চল না, আমি যাইতেছি।

শম্ভুজি হাসিয়া বলিল, যমকে ভয় কর না, কিন্তু এক জন চোরের ভয়ে বাহির হইতে সাহস হইতেছে না।

রাম। সাহস হইতেছে না কি? আমি দস্যুর ভয় রাখি না ; তবে শাতের ভয় হয়।

শম্ভুজি। ডাকাইত যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ?

রাম। শম্ভুজি, ও সব অমঙ্গলের কথা বলিও না। বাহির হইয়া দেখ। না, বাহির হইয়াও কাজ নাই, যদিই দস্যুর দল প্রবল হয়, সকলে একত্র না থাকিলে আত্মরক্ষা কঠিন হইবে।

আমি আমাদের বস্ত্রাবরণের দিকে চলিলাম। অমনি দ্রুতপাদক্ষেপ-শব্দ। বাহির হইয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি দ্রুতপদে বনাভিমুখে দৌড়িতেছে।

এই সময়ে শম্ভুজি যষ্টিহস্তে বাহির হইল ; ধ্বজাধারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হিংসা করিও না, ধর্ম্মনাশ হইবে।

শম্ভুজি না শুনিয়া পলায়িতের পশ্চাৎ দৌড়িল। যোগজীবন, দেবীপ্রসাদ ও ধ্বজাধারী বাহিরে আসিলেন। ধ্বজাধারী আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন— "হিংসা করিও না।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, স্বর্গযাত্রার বিঘ্ননাশ ও আত্মরক্ষা কর্ত্তব্য। অনাবশ্যক হিংসা যেন না হয়।

আমি সমবেগে শম্ভুজির অনুগামী হইলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি তুষারসঙ্ঘাতের উপর স্ত্রীমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। শম্ভুজি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যষ্টিদ্বারা তাহাকে ঠেলিতেছে। বুঝিলাম শীতে অবসন্ন হইয়া, তুষারের উপর স্খলিতপদে রমণী পড়িয়া গিয়াছে। বলিলাম, শম্ভুজি "তুমি অতি পাষণ্ড, মুমূর্ষু স্ত্রীকে আঘাত করিতেছ।"

শম্ভু। তোমার কি?—তুমি জান না; এ ডাকাইতের চর। স্ত্রীবেশ ধরিয়াছে।

আমি। যাহাই হউক, মুমূর্ষু লোককে আঘাত করা নিতান্ত কাপুরুষতা।

শম্ভু। আমি কাপুরুষ কি বীরপুরুষ সকলেই জানে, তোমার সে কথায় কাজ কি?

আমি। আমার কাজ এই, ইহাকে আঘাত করিও না।

শম্ভু। এই আবার মারিলাম, তুমি বীরপুরুষ—নিবারণ কর।

আমি শম্ভুর হস্ত হইতে লাঠি কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলাম। শম্ভুজি আমাকে মারিতে আসিল, আমার বাহু আঘাতে পশ্চাতে পড়িয়া গেল; তখন উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে লাঠি আনিতে দৌড়িল।

এই সময়ে যোগজীবন আসিয়া মূর্চ্ছিত রমণীর মস্তক কোলে করিয়া বসিল। আমি দেখিয়া হাসিলাম।

যোগজীবন বলিল, হাসিতেছেন কেন?

আমি। স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার দয়া ও আদর দেখিয়া হাসিতেছি।

যোগজীবন হাসিয়া বলিল, দেখুন, ইহার সুন্দর মুখ চাঁদের আলোকে কেমন উজ্জ্বল দেখাইতেছে, আমি দেখিলাম, যথার্থই সুন্দর মুখ চন্দ্রালোকে ঝকিতেছে।

আমাদের বচসা শুনিয়া রাজা উচ্চৈঃস্বরে আমাদিগকে ডাকিতে ছিলেন; ধ্বজাধারী তাঁহার দক্ষিণ পদ বাম পদের অগ্রে ৩০ বার ও বাম পদ দক্ষিণ পদের অগ্রে সমদূরে ২৯ বার ফেলিয়া আমার নিকট আসিলেন। শম্ভুজিও ঠিক সেই সময়ে লাঠি লইয়া আসিল। ধ্বজাধারীর আগমনে বিবাদ নিবারণ হইল; কিন্তু শম্ভুজির ক্রোধ উপশম হইল না। আমরা সকলে ধরিয়া স্ত্রীলোকটিকে বস্ত্রাবাসের ভিতর আগুনের নিকট আনিলাম। তখন সে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন; বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিলে মানুষের মনে যে করুণার উদয় হয়, তাহাতেই হউক, আর মোহের এমন কোন ধর্ম্মই থাকুক, এই অবস্থায় তাহার স্বভাবসুন্দর মুখ আরও সুন্দর বোধ হইল।

অগ্নি ও বস্ত্রের উত্তাপে অনেক ক্ষণের পর মেঘমুক্ত দুই সূর্য্যের ন্যায় দুই চক্ষু উন্মীলিত হইল। আমরা একদৃষ্টে তাহার মোহমুদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম; এখন সকলেরই হৃদয়ের আনন্দ মুখে দেখা দিল। রমণী আমাদের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; চক্ষু নিমীলিত হইল, চেতনাও তিরোহিত হইল।

যোগজীবনও চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা রমণীর মস্তকের নিকট বসিয়া পড়িল। দেবীপ্রসাদ চকিত ও ম্লান হইলেন। মনুষ্যপুত্তলী ধ্বজাধারীর চক্ষেও একবিন্দু জল আসিল।

পৃথিবীতে যিনি যত জ্ঞানী হউন, কোন মহদভীষ্টসিদ্ধিকামনায় উন্মত্ত হউন, গৃহী হউন বা সর্ব্বত্যাগী উদাসীন হউন, বিপন্না রমণীর সুন্দর মুখশ্রী মলিন দেখিয়া কাঁদিতেই হইবে। যাহারা পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া লোকের সর্ব্বনাশ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—এ অবস্থায় তাহাদিগকেও কাঁদিতে হইবে। যিনি দম্ভভরে ইহা অস্বীকার করিবেন, তিনি হয় মিথ্যাবাদী, না হয়, হিংস্র শ্বাপদ্দিগের অপেক্ষাও ক্রূরপ্রকৃতি।

বিপন্না রমণীর বয়স দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। যৌবন-লাবণ্য এখনও তাহার শরীরে আবির্ভূত হয় নাই। বাস্তবিক সে সম্পূর্ণ বালিকা। ভয়ের চিহ্ন তাহার মুখে স্পষ্ট প্রকাশমান। হস্ত ধরিয়া দেখিলাম রক্তের স্রোত অতি প্রবল বেগে চলিতেছে। আমরা আগ্রহের সহিত আবার তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম।

যোগজীবন বলিল ইহার বস্ত্র তৈলাক্ত বোধ হইতেছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া জানিলাম তাহার বস্ত্র, কেশ ও সমস্ত শরীর এক প্রকার স্নেহ দ্রব্যে সম্পূর্ণ সিক্ত।

রামটহল বলিল আমাদের প্রথম অনুমান মিথ্যা নয়। এ নিশ্চয়ই দস্যুদিগের চর। তাহাদের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে এত তৈল মাখিয়া আসিয়াছে।

শম্ভুজী। ইহার মূর্চ্ছাও ভাণ; আমি বেশ বুঝিয়াছি, প্রহার না করিলে এ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে না।

দেবী। পাষণ্ড শ্বাপদ, তুমি স্বর্গযাত্রার পাত্র নও। রামটহল, তোমার বন্ধুকে বিদায় দাও; নতুবা তুমিও বিদায় হও।

রামটহল কাঁদিল; রাগ করিয়া শম্ভুজীকে চলিয়া যাইতে বলিল। শম্ভুজি বিষণ্ণভাবে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ পরে বালিকার মোহাপগম হইল; ধ্বজাধারী পাহাড়ী ভাষায় তাহাকে অভয় দিলেন। বালিকা প্রথমে কথা কহিল না। আজি বাক্য-ব্যয়কুণ্ঠ ধ্বজাধারীর ব্রতভঙ্গ হইল; দেবীপ্রসাদের অনুরোধে তিনি অনেক কথা বলিলেন। আমি কথোপকথনের অনেক কথা বুঝিলাম না। তবে একরূপ মর্ম্ম বোধ হইল। বালিকা বলিল 'আমাকে আগুনে ফেলিয়া দিও না।'

ধ্বজা। দিব না।

বালিকা। তবে আগুনের কাছে কেন?

ধ্বজা। শীত-নিবারণের জন্য।

বালিকা। আমার ত শীত করিতেছে না; তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি যাই।

ধ্বজা। কোথায় যাবে?

বালিকা। তোমরা যেখান হইতে আনিয়াছ?—আমি মার কাছে যাই।

ধ্বজা। তোমদের ঘর কোথায়?

বালিকা। তোমারা জান না? মাকে আগুনে ফেলিয়াছে?

ধ্বজা। না।

বালিকা অনেক ক্ষণ আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল, চারি দিকে চাহিল—বলিল "তোমরা কে।"

ধ্বজা। সন্ন্যাসী; তোমাদের ঘর কোথায়?

বালিকা। তোমরা জান না?

ধ্বজা। না।

বালিকা। আমাকে কে আনিল?

ধ্বজা। পলাইয়া আসিয়াছ।

বালিকা একটু আশ্বস্তা হইল। তাহার কথায় পরে বুঝা গেল, কয়েকজন

মহান্ত তাহাকে ও তাহার জননীকে ধরিয়া বনের মধ্যে আনে। তাহার পর তাহাদিগকে তৈল মাখাইয়া, বন্ধন খুলিয়া, আগুনে ফেলিতে যায়, তাহার মা মৃদুস্বরে বলিল "মনিয়া তুমি এই দিকে পলাইয়া যাও; বলিয়াই আপনি প্রাণ-পণে অন্য দিকে ছুটিল। মহান্তেরাও তাহার পশ্চাৎ ছুটিল; এই অবসরে কন্যাও মাতারআদিষ্ট দিকে পালাইল। অনেক দূর দৌড়িয়া সে আমাদের বস্ত্রাবাসের নিকট আইসে। আমাদিগকেও মহান্ত-বেশধারী দেখিয়া সে ভয়ে পলাইতে ছিল।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, হরিচরণ, বোধ হয় স্বর্গযাত্রার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দেবতারা ছলনা করিতেছেন, তাহা হইলে বিপন্নের উদ্ধার পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক বালিকা। ইহাকে আশ্রয় না দিলে অধর্ম্ম হইবে। ইহার রক্ষার উপায় স্থির কর।

ধ্বজাধারী বলিলেন, পুংবেশধারণ।

সেই প্রস্তাবই শেষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির হইল। মনিয়া পুরুষ বেশ ধারণ করিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই অনেক মনুষ্যের পদশব্দ শুনা গেল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, ঘাতকেরা আসিতেছে। ধ্বজাধারীর প্রস্তাব মত আমি, রামটহল, শম্ভুজি ও মনিয়া শয়ন করিলাম। দশ জন সন্ন্যাসী গৃহ মধ্যে আসিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নানা কথা কহিল; শেষে কিছু সন্দেহ না করিয়া চলিয়া গেল।

তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছিল। ধ্বজাধারী মনিয়াকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের ঘর কোথায়।

মনিয়া। "দওরা।"

ধ্বজা। কোন দিকে, কত দূর ?

মনিয়া। জানি না।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, এই বালিকাকে এখানে ফেলিয়া গেলে ইহার জীবন শংসয়। আমার মতে ইহাকে যমুনোত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাউক।

ধ্বজা। সেখানে গঙ্গাদেব ইহার ভার লইবেন।

মনিয়া বলিল—মা!

রাজা। অবোধ বালিকা, এ সংসারে বোধ হয় মাতার দর্শন আর তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না। তোমার মাতা যদি সতী ও ধার্ম্মিকা হন, হয়ত এতক্ষণে অনন্তধামে গিয়াছেন। ইচ্ছা হয়, আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতেও প্রস্তুত আছি।

মনিয়া হিন্দী বুঝিত; বলিতেও পারিত। রাজার কথা শুনিয়া হিন্দীতে বলিল—আমি সেই খানেই যাইব।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও ধ্বজাধারী মনিয়াকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। আমি, শম্ভুজি ও রামটহল আমাদের বস্ত্রাবাস ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। রামটহল ও শম্ভুজি শয্যা ও তুষারসিক্ত বসনগুলি ঘোড়াদিগের পৃষ্ঠে রাখিতে গেল। আমি একবার আগুনের নিকট বসিলাম। সঙ্গীরা কার্য্য শেষ করিয়া চলিল, আমিও উঠিতেছি, হঠাৎ অগ্নির নিকটবর্ত্তী সংগৃহীত কাষ্ঠের মধ্যে পতিত একটা কলমদানের ন্যায় কাষ্ঠাধারের দিকে দৃষ্টি পড়িল। হাতে লইয়া দেখি, তাহার উপরিস্থিত খণ্ড চাবি দিয়া বন্ধ রহিয়াছে; বুঝিলাম, মহান্তেরা ভ্রমক্রমে ফেলিয়া গিয়াছে।

কাষ্ঠাধার লইয়া ঘোড়ায় উঠিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া চাবি ভাঙ্গিয়া দেখি, ভিতরে একখানি জীর্ণ কাগজ রহিয়াছে। খুলিয়া পড়িলাম। তাহাতে লেখা আছে—"রাজা শিবসিংহের পত্নী ও শিশু কন্যাকে হিমালয়প্রান্তে দওরা ও বাধুয়া গ্রামে পাঠাইলাম। কখন যেন ইহাদের পুনর্ম্মিলন না হয়। আর শিবসিংহের বংশ লোপ আমার উদ্দেশ্য। এ কন্যা যদি জীবিত থাকে, যেন কখন ইহার বিবাহ না হয়। যদি বিবাহঘটনা কখন অপ্রতীহার্য্য হইয়া উঠে, তখন আর যেন স্ত্রীহত্যার ভয় না করা হয়। যে দিন শুনিব শিবসিংহ নিঃসন্তান হইয়াছে, সেই দিন দেবশরণের প্রাণবধের পরিশোধ হইবে। সেই দিন সংবাদদাতা হরিপুরে জীবস্বামীর আশ্রমে আসিলে লক্ষ টাকা পুরস্কার

পাইবেন। তবে ইহাও বলিতেছি, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে যেন স্ত্রীহত্যা করা না হয়। আমার আদেশ পালনের বেতন স্বরূপ ১০ সহস্র টাকা জীবস্বামীর নিকট পাঠাইলাম।”

পত্রখানি গুড়াইয়া আধারে রাখিলাম। নিতান্ত অন্যমনে যাইতেছি, সহসা রামটহলের চীৎকার-শব্দে চমক ভাঙ্গিল। সম্মুখে অঙ্গার ও ভস্মরাশি-মধ্যে অর্দ্ধদগ্ধ মৃতশরীর পড়িয়া রহিয়াছে। মনিয়া সেই গলিতদেহের উপর পড়িয়া পাংশুবিলুণ্ঠিত হইতেছে ও একপ্রকার অস্ফুট অনুচ্চ শব্দ করিতেছে।

রাজার আদেশে রামটহল ও শম্ভুজী মনিয়াকে টানিয়া লইল। আমি নামিয়া তাহাকে আমার ঘোড়ার উপর উঠাইলাম; এবং অতিদ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সকলের অগ্রসর হইলাম।

মনিয়া প্রবোধ শুনিল না। আমি বলিলাম, মনিয়া স্থির হও; মহান্তেরা যদি জানিতে পারে, আমরা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।”

মনিয়া শুনিল না।

আমি। মনিয়া, মিনতি করিতেছি, এখনও স্থির হও। যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, চুপ কর।

মনিয়া শুনিল না।

আমি। মনিয়া, রোদন শুনিতে পাইলেই মহান্তেরা দৌড়িয়া আসিবে, তখন আর তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।

মনিয়া। আমি আর বাঁচিব না, মার কাছে যাব।

মনিয়া আবার কাঁদিল।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা সকলে একত্র হইলাম। রাজা ও যোগজীবন মনিয়াকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মনিয়া বলিল, মোহন্তদিগকে ভয় কি—আমি মার কাছে যাইব।

রাজা। মহান্তেরা জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করিবে, সে কি প্রার্থনীয়? তোমার মাতা যেখানে গিয়াছেন, তোমার ইচ্ছা হয়, চল, আমি সুখসাধ্য উপায়ে তোমাকে সেই স্থানে—

মনিয়া। এত লোক থাকিতে মোহন্তেরা আমাকে পুড়াইবে?

রাজা। তাহাদের সংখ্যা বেশি, স্থানও পরিচিত, তাই ভয় করিতেছি।

মনিয়া। আমার হাতে তীর ধনু দাও।

রাজা। তুমি কি করিবে, তাহারা কত লোক জান?

মনিয়া। দুই এক জনকে মারিলেই আর সকলে পালাইবে।

বালিকার কথা, তাহার সাহস ও নেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। মনিয়া ক্রমে একটু শান্ত হইল। দুই প্রহরের পর সে পাদচারে যোগজীবন ও ধ্বজাধারীর সঙ্গী হইল।

যাইতে যাইতে দেবীপ্রসাদ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এত দিন তপস্যা করিলাম, তথাপি আমার মনের সংযম হইল না। এখন সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, এখনও পার্থিব মায়া আমাকে ত্যাগ করিল না। এখন আমার মন এই বালিকার উপর স্নেহপ্রবণ হইল।

আমি। মনিয়ার সরল, মধুর মুখশ্রী দেখিলে বাস্তবিক ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

রাজা। এ সকল স্বর্গযাত্রার বিঘ্ন—বেশ বুঝিতেছি। আমার মন এখন গৃহীদের ন্যায় হইয়াছে। মায়াজালে আবদ্ধ লোক স্বর্গগমনে অধিকারী হয় না।

রাম। আমার মতে মনিয়াকে অধিক দূর সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

রাজা। মনিয়া বালিকা, আবার মাতৃহীন হইল, তাহাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া গেলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ করা হয়।

রাম। কাহারও হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেই হয়।

রাজা। কাহার হস্তে দিয়া যাইব, কে মনিয়ার মাহাত্ম্য বুঝিবে?

রাম। মনিয়া নিজেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। সে নিতান্ত বালিকা নয়।

রাজা। সেই আমার ভয়। মনিয়ার অলৌকিক রূপ যখন যৌবনে পরিমার্জ্জিত হয়ে উজ্জ্বল হইবে, তখন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে, এমন কে আছে? মনিয়াকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাই।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চারি দিবস পথে আমাদের কোন নূতন ঘটনা হইল না। কেবল তৃতীয় দিনে শুনিলাম এক স্ত্রীলোকের হত্যাপরাধে পাঁচ মহান্ত পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। চতুর্থ দিবস অপরাহ্নে আমরা যমুনোত্রিতে উপস্থিত হইলাম।

আমরা ধ্বজাধারীর পরিচিত গঙ্গদেবের মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, আশ্রমের ঘরগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, সুপরিষ্কৃত ও বাসের উপযুক্ত; চারিদিকে পুষ্পোদ্যান—চামেলি, মল্লিকা প্রভৃতির মনোহর গন্ধে আমোদিত; তাহার পর বদরী, আখ্‌রোট ও ভূর্জ্জপত্রের গাছ। প্রত্যেক গাছের তলায় পরিষ্কৃত প্রস্তরবেদী। প্রত্যেক বেদীর প্রান্তে এক একটু অগ্নি রাখিবার স্থান। সন্ন্যাসীরা সেই স্থানে বসিয়া অগ্নিসেবন ও ধূমপানে ব্যস্ত।

আশ্রম দেখিয়া মন প্রসন্ন হইল। আমরা অগ্নির নিকট মৃগচর্ম্মে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে মঠধারী গঙ্গাদেব যমুনাজলে নিয়মস্নান সমাপন করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন; প্রত্যেক অতিথিকে বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। আমাদের থাকিবার জন্য দুইটি ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল।

সন্ধ্যার পর তুষারপাত আরম্ভ হইল। রাজা ও ধ্বজাধারী গঙ্গাদেবের সহিত দেবালয়ে গেলেন। রামটহল ও শম্ভুজিও তাহাদের অনুগামী হইল। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আমি, যোগজীবন ও মনিয়ার সহিত গৃহমধ্যে আশ্রয় লইলাম।

বসিয়া অগ্নি সেবন করিতে করিতে যোগজীবন হাসিয়া বলিল, স্ত্রীবেশ অপেক্ষা মনিয়ার সন্ন্যাসিবেশ আমার নিকট অধিক সুন্দর দেখায়। আমার মতে নবীন সন্ন্যাসী রূপে জগৎ সংসার ভুলাইতে পারে। মনিয়া উত্তর করিল না। যোগজীবন বলিল, গুরুজি যে কথা কহিতেছেন না?

আমি। কি বলিব? মনিয়া বালিকা; উহাকে এরূপ উপহাস করা অনুচিত।

যোগ। মনিয়া, তোমার পিতাকে মনে পড়ে?

মনিয়া। আমার আসল বাপকে মনে পড়ে না।

যোগ। তবে কোন বাপকে মনে পড়ে?

মনিয়া। বিশ্‌য়া জোরি।

যোগ। তোমাদের বাটী পূর্ব্বে কোথায় ছিল, মনে আছে?

মনিয়া। কিছুই মনে নাই। আমি জানিতাম বিশ্‌য়া জোরি আমার বাপ; তাহার স্ত্রী আমার মা। তার পর প্রায় এক বৎসর হল, মা দুই মোহন্তের সঙ্গে আসিলেন।

যোগ। তারপর; তুমি কি চিনিলে?

মনিয়া। তিনি পরিচয় দিলেন।

যোগ। তাঁকে তোমার বাপ ও তোমাদের বাটীর কথা জিজ্ঞাসা কর নাই?

মনিয়া। করিয়াছিলাম; কিন্তু মা বলিলেন না। তিনি বলিলেন,—পরিচয় বলিবেন না বলিয়া শপথ করাতেই, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

যোগ। এই এক বৎসর তুমি মাতার সঙ্গেই ছিলে?

মনিয়া। না, তিনি প্রতিমাসে একবার আসিয়া দুই দিন থাকিতেন।

যোগ। মহান্তেরা তোমাদিগকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছিল কেন?

মনিয়া। সে মার দোষ। তিনি গোপনে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেন। তাহাতে মোহন্তদের রাগ হয়; মাও জানিতে পারিয়া ছিলেন, মোহন্তরা তাঁকে মেরে ফেলিবে, সেই জন্য তিনি আমাকে এই কবচ দিয়াছিলেন।

মনিয়ার শোকগম্ভীর মুখ নীরব হইল। অনেক ক্ষণের পর যোগজীবন তাহার বাহুস্থিত কবচখানি খুলিতে উদ্যত হইল। মনিয়া বারণ করিল। যোগজীবন বলিল "দেখি কিরূপ কবচ।"

মনিয়া। মার বারণ আছে; যাহার সহিত আমার বিবাহ হবে, তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও কবচ দেখিতে দিব না।

যোগ। যদি আমার সহিত বিবাহ হয়?

মনিয়া। হইলে দেখাইব।

যোগ। যদি তোমার বিবাহ না হয়?

মনিয়া। কাহাকেও দেখাইব না।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মনিয়া যে অতি প্রধানবংশজ এবং রাজা শিবসিংহের কন্যা, এতদিনে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল; কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে, দুষ্টলোক-দিগের চক্রে তাহার অদৃষ্ট নিয়মিত হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, রাজা বা ধ্বজাধারীর নিকট যদি রাজা শিবসিংহের পরিচয় পাই, এই অলৌকিক কন্যারত্ন লইয়া গিয়া তাঁহাকে উপহার দিব। রাজাকে বলিয়া আমার হিমালয় ভ্রমণ এইখানেই শেষ করিব।

অপরিচিত বালিকার মুখ দেখিয়া যদি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মনে স্নেহ জন্মে, তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় যুবাপুরুষের মনে বিকার জন্মিবে, ইহা লোকের নিকট বিচিত্র বোধ হয় না; কিন্তু আমার নিকট বিচিত্র বোধ হইল। আমি কোন প্রকার মায়ার বশ নহি, কখন হইব না, বলিয়া চিরকাল আমার দম্ভ ছিল। এখন সহসা সেই দর্প চূর্ণ হইবার উপক্রম দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। মায়ার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যদি এ ক্ষোভ জন্মিত, তাহা হইলে চিত্ত-বিকার সংবরণ করিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তখন এ কথা মনে আসে নাই। মনিয়াকে দুই চারি দণ্ড দেখিয়া তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়ামিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আর দুই চারি দণ্ডে তাহার পরিপাক হইতে লাগিল। তাহার পর মনিয়ার শোক-পীড়িত অবস্থা দেখিলাম। মনের আবেগে তাহাকে আপনার ঘোড়ায় উঠাইয়া ছুটিলাম। যাইতে যাইতে যতবার মনিয়ার শোকমলিন মুখ দেখি, ততই হৃদ-য়ের আবেগ বাড়িতে লাগিল। তখন মনিয়াকে যে সকল প্রবোধ বাক্য বলিয়াছিলাম, অন্য সময়ে সে সকল কথা কখনই আমার মুখ হইতে বাহির হইত না।

তাহার পর সময়ে সময়ে সেই সকল কথা মনে করিলে হাসি আসিত।

আবার কখন মনের আবেগে সে লজ্জা ভাসিয়া যাইত। এই চারি দিবস মনিয়ার সহিত দুই চারিটি ভিন্ন কথা কহি নাই। অন্যের সম্মুখে দূরে থাকুক, সে আমার দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাহার দিকে চাহিতে পারিতাম না। আজিও কেবল যোগজীবনের অনুরোধে আমাকে এই লজ্জার দায়ে পড়িতে হইয়াছিল।

মনিয়ার পরিচয় পাইয়া আমার পূর্ব্বস্নেহ হৃদয়ের অন্তস্তলে দৃঢ়মূল হইল। নীরবে তাহার নিয়তির পরিবর্ত্তন ভাবিতেছি রাজা ও ধ্বজাধারী গৃহমধ্যে আসিলেন। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে রাজা শিবসিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, কেন ?

আমি। তাঁহাকে অমূল্য রত্ন প্রদান করিব।

রাজা। কি রত্ন।

আমি। মনিয়া, তাঁহার কন্যা।

রাজা। কিরূপে জানিলে, মনিয়া রাজা শিবসিংহের দুহিতা।

আমি পত্রখানি বাহির করিয়া রাজাকে দিলাম, রাজা পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ আরক্ত, ওষ্ঠ শুষ্ক, চক্ষু চঞ্চল, হস্ত বিকল হইয়া আসিল ; সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, বসিয়া পড়িলেন। পাঠশেষ হইলে উল্লাসে শব্দ করিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন হরিচরণ, কিরূপে জানিলে মনিয়াই রাজা শিবসিংহের দুহিতা ?

আমি। মনিয়ার মুখে তাহার যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

রাজা আবার পত্রখানি পড়িলেন। সকলেই শুনিল। রাজা সহসা উঠিয়া বলিলেন—বাপ হরিচরণ, তুমি যথার্থই আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে। মনিয়া, মা তারা, মা আমার—

রাজা। দৌড়িয়া গিয়া মনিয়াকে ক্রোড়ে লইলেন, বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন, শতবার মুখচুম্বন করিলেন, শেষে মনিয়ার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অশ্রুজলে উভয় শরীর ভিজিতে লাগিল।

রাজা। বলিলেন মা তারা, ভাবিয়া ছিলাম, পৃথিবীতে তোমাদের মুখ

আর দেখিতে পাইব না। তোমাদের জন্য আমি গৃহত্যাগী, রাজ্যত্যাগী, সংসারত্যাগী। মা শেষে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। মনে করিয়া ছিলাম আমার হৃদয়ের ধন পৃথিবীতে আর কিছুই নাই, দুরাত্মারা আমাকে বংশহীন করিয়াছে। জগদীশ্বর, দয়াময়!

রাজার আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। মনিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল; শেষে কথা না কহিয়া কাঁদিল; গৃহমধ্যস্থ সকলেই কাঁদিল। শম্ভুজির পাষাণ হৃদয়ও গলিল। কেবল রামটহল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এতদিনের পর রাজা দেবীপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। তিনি পশ্চিম-উড়িষ্যার কোকিলভঞ্জের রাজা শিবসিংহ। তাঁহার সহোদর লক্ষ্মণ-সিংহের প্রবর্ত্তনায় এবং দেবসেবক রামজয় নামে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে তাঁহার পাঁচটি পুত্র কন্যা ক্রমে ক্রমে অপহৃত ও বিনষ্ট হয়। তাহার পর সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজা শিবসিংহ রামজয়কে সবংশে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। লোকেরা রামজয়ের বাটী ঘেরিল। রামজয় অপথে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিলেন; তাঁহার স্ত্রী ধরাপড়িবার ভয়ে পলাইয়া শেষে বর্ষাপ্রখরা সুবর্ণরেখার জলে ঝাঁপ দিলেন। রাম জয়ের কুলমণি নামে দ্বাদশ বর্ষীয় এক পুত্র ছিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। লোকে বলিল, সে সৈনিকদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে।

ইহার দুই বৎসর পরে রাজা শিবসিংহের মহিষী পুরুষোত্তম তীর্থ দর্শন করিয়া রাজধানীতে আসিতে ছিলেন। তাঁহার এক বর্ষীয় দুহিতা তারা সঙ্গে ছিল। পথে বনমধ্যে সহসা দস্যুর দল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। রাজা মনে করিয়াছিলেন, দস্যুরা তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে বিনাশ করিয়াছে। তিনি অধীর হইলেন। চারিদিকে দস্যুদের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, বৎসর

কাটিয়া গেল,কোন সন্ধান হইল না। এদিকে রাজভবন ক্রমে শত্রুসঙ্কুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শত্রুদিগের কথায় পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয় রাজগণও তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন। শেষে সংসারে বিরক্ত হইয়া শিবসিংহ একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে গোপনে রাজধানী ত্যাগ করিলেন। শত্রুদিগের অনুসরণ এড়াইবার মানসে দেবীপ্রসাদ নাম লইলেন। তিনি প্রথমে চিত্রকূটে আসিয়া চারি বৎসর বাস করেন। সেখানে অরণ্যবাসে বিরক্ত হইয়া শেষে কাশীতে আসিলেন। কাশীতে আসিবার এক বৎসর পরে তাঁহার অরণ্যবাসসহচর বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রাণত্যাগ করিলে শিবসিংহ গঙ্গার পরপারে রাজাশ্রম নির্ম্মাণ করেন। রাজা চিনিতে পারিলেন, মনিয়ার পরিচায়ক পত্রখানি লক্ষ্মণসিংহের স্বহস্তলিখিত। মৃত মহিষীর প্রতি সম্মানবুদ্ধিতে রাজা মনিয়ার কবচ খুলিলেন না।

তুষারপাতে চারিদিকের পথ রুদ্ধ হইল। আমরা যমুনোত্রির আশ্রম-মধ্যে বন্দী হইলাম। প্রাতর্ভ্রমণ বন্ধ হইয়া গেল। একদিন মধ্যাহ্নে অন্য-মনে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রম হইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িলাম। মনুষ্যসঞ্চাররহিত অরণ্যে পাপিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছিল। আমি চিন্তা ছাড়িয়া গান শুনিতে লাগিলাম। সহসা মনুষ্যপদশব্দে চমক ভাঙ্গিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, যোগজীবন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, যোগ-জীবন, তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?

যোগ। মনের শান্তি লাভের আশায়।

আমি। তোমার কি এত অসুখ?

যোগ। আপনি বুঝিবেন না; বলিব না।

আমি। তুমি আমাকে আত্মীয় মনে কর না?

যোগ। করি; সেই জন্য একটি সংবাদ দিব।

আমি। কি সংবাদ।

যোগ। রাজা কি মহাপ্রস্থানে যাইবেন, না ফিরিবেন।

আমি। তাহার নিশ্চয় নাই।

যোগ। তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবেন। তাঁহার পরম শত্রু আশ্রমে আছে। আপনিও সাবধান হইবেন।

আমি। কে শত্রু।

যোগ। রামটহল, কোকিলভঞ্জের রামজয়ের পুত্র।

আমি। কিরূপে জানিলে?

যোগ। তাহার মুখে শুনিয়াছি। আমি এখন তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস-ভাজন।

আমি। সে কিরূপে রাজার সহিত মিলিল। সে ত মরিয়াছে।

যোগ। মরে নাই, বাটী হইতে পলাইয়া এক গোয়ালার আশ্রয় লয়। গোয়ালা তার নাম পরিবর্ত্তন করে একমাস গোপনে রাখে; তার পর কাশী-গামী মহান্তদের সঙ্গে পাঠাইয়া দেয়। রামটহল কাশীতে ভৈরবী আখড়ায় সাত বৎসর ছিল। তার পর রাজার নিকট কর্ম্ম পায়। এখন পরিচয় পাইয়া রাজার প্রাণনাশ-সংকল্প করিয়াছে; আপনাকেও বধ করিবে।

আমি। কেন?

যোগ। আপনি রাজার হিতৈষী। তদ্ভিন্ন আপনি থাকিতে রাজার সম্পত্তি ও কন্যা তার হস্তগত হবে না।

আমি। রামটহল কি মনিয়াকে বিবাহ করিতে চায়?

যোগ। এখন বিবাহ করিবে না। আবশ্যক হয়, বিবাহ করিয়া কোকিলভঞ্জের সিংহাসন দাবী করিবে। আবার শম্ভুজিও চেষ্টায় আছে, যদি মনিয়াকে হস্তগত করিতে পারে।

আমি। এই সূত্রে দুই জনে বিবাদ হইতে পারে।

যোগ। দুইজনই ধূর্ত্ত। এখন বিবাদ করিবে না।

আমি। চল রাজাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি।

যোগ। এখন বলিবেন না। রামটহল এখন যেরূপ প্রভুভক্তি দেখাই-তেছে, বলিলেও তিনি এখন বিশ্বাস করিবেন না। সুবিধা মত বলা যাইবে।

---

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

যমুনোত্রিতে আমাদের ছয়মাস অতীত হইল। আমাদের সম্বন্ধে আর

কোন নূতন ঘটনা হইল না। তুষারপাতে আশ্রমে নূতন লোকের আগমনও বন্ধ করিয়াছিল। আমরা প্রায়ই দিবারাত্রি গৃহমধ্যে অগ্নিসমীপে বসিয়া থাকিতাম। রামটহলের প্রভুভক্তি এত বাড়িয়াছিল যে তাহার অভিপ্রায়ের কথা রাজাকে বলিতে অবসর পাই নাই।

কেবল মনিয়ার কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। প্রত্যূষের অরুণালোকের ন্যায় তাহার শরীরে নূতন যৌবনের আভা প্রকাশ পাইল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আর পূর্ব্বে যেমন মনিয়াকে দেখিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে আমার সঙ্কোচ হইত, এখন বরং তাহার বৃদ্ধি হইল। সকলে একত্র বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে কখন কখন মনিয়ার সহিত কথা কহিতে হইত, কিন্তু সে সময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতাম না। আবশ্যক কার্য্যানুরোধে যদি কখন একাকিনী মনিয়াকে কিছু বলিতে হইত, সে সময়ে নিয়তই আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিত, শরীরে রক্তের স্রোত প্রবলবেগে বহিত, মনিয়া পাছে আমার তদনীন্তন ভাব বুঝিতে পারে এই আশঙ্কায় লজ্জিত ও ভীত হইতাম।

এদিকে মনিয়াকে অধিকক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। শেষে স্থির করিলাম, একদিন মনিয়ার সহিত নির্জ্জনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিব, তাহা হইলেই এভাব অপনীত হইবে।

অপরাহ্নে যোগজীবন, রামটহল ও শম্ভুজি একত্রে গৃহের বাহির হইল। রাজা ও ধ্বজাধারী গঙ্গাদেবের নিকট গমন করিলেন। আমি ও মনিয়া গৃহমধ্যে বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর মনিয়া প্রথম কথা কহিল, সে বলিল তুমি কত দিন মোহন্ত হইয়াছ?

"এক বৎসর অতীত হইয়াছে।"

"মোহন্ত হইলে কেন?—মোহান্তরা বড় দুষ্টলোক।"

"সকলেই কি দুষ্টলোক?"

"প্রায় সকলেই।"

"রাজা স্বয়ং মহান্ত।"

"তিনি মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করেছেন।"

"যোগজীবন মহান্ত।"

"যোগজীবনও মনের দুঃখে মহান্ত হয়েছিল। সে আর অধিক দিন মোহন্ত থাকিবে না।"

"রামটহল মহান্ত।"

"রামটহল দুষ্টলোক।"

"কিরূপে জানিলে।"

"যোগজীবন রামটহলের বিষয় ভালরূপে জানে, সেই বলিয়াছে। তার আকার ও কাজ দেখেও আমার তাই বোধ হয়। যোগজীবন বলিয়াছে, আমার কাছে রামটহলের পরিচয় দিবে।"

"রাজা যদি রামটহলের সহিত তোমার বিবাহ দেন?"

"আমি নিবারণ করিব। আমি তাহাকে ভাল বাসি না।"

"মা যাহার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ছিলেন, তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে।"

"আমি তাহাকে দেখি নাই, বিবাহের পর বোধ হয় ভাল বাসিতাম।"

"রামটহলকেও বিবাহের পর ভাল বাসিবে?"

"রামটহলকে আমি ঘৃণা করি; তার সহিত কথাও কহিনা।"

"তুমি কাহাকে বিবাহ করিবে?"

"কাহাকেও নয়।"

"কেন?"

"বলিব না।"

মনের আবেগে আমি মনিয়ার হস্তধারণ করিলাম, বলিলাম, মনিয়া বল কেন তুমি বিবাহ করিবে না। মনিয়া, তুমি আমার সর্ব্বস্বধন; বল, তুমি আমায় বিবাহ করিবে না? আমায় ভাল বাসিবে না?

মনিয়া। তুমি যে ব্রাহ্মণ; আমি তোমায় ভক্তি করি, আর ভয় করি।

আমি। আমায় ভাল বাসিবে না?

মনিয়া। ব্রাহ্মণকে কি ভাল বাসা যায়?

আমি। কেন যাবে না?

মনিয়া। তবে ভাল বাসিব।

আমি। মনিয়া, আমি স্থির বুঝিয়াছি, তুমি ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর সুখ কোথাও নাই ; বল আমাকে বিবাহ করিবে।

মনিয়া। পিতা আমার বিবাহ দিবেন।

আমি। আমি তাঁহার মত লইব। স্বীকার কর, রাজার মত হইলেই তুমি আমার হইবে।

মনিয়া। তুমি ও স্বীকার কর, আমাকে চিরকাল ভাল বাসিবে।

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম—না মরিলে আমাদের প্রণয় যাইবে না। দশবার এই কথা বলিয়া বাসগৃহ হইতে বাহির হইলাম।

তখন গঙ্গাদেব তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ধর্ম্মোপদেশদান আরম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেব প্রাচীন ও জ্ঞানী লোক। আমি কখন তাঁহার উপদেশ শুনি নাই। আজি অন্যমনে নিকটে আসিয়া পড়াতে শ্রোতাদিগের মধ্যে বসিলাম।

গঙ্গাদেব বহুকাল দেবার্চ্চনা ও যাগযজ্ঞ করিয়া এখন উপরের শ্রেণীতে উঠিয়াছেন। এখন ধ্যান, প্রার্থনা ও ধর্ম্মোপদেশদানই তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম। তিনি বলিলেন যদি জ্ঞানী হইতে চাও, অমর হইতে চাও, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, প্রতিদিনের ভোজ্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা কর।

রামটহল সেখানে বসিয়া ছিল ; সে বলিল " কি লাভ, ঈশ্বর কি প্রার্থনা শুনিয়া আমাদের আবশ্যক বস্তু সকল দিতে আসিবেন ? "

গঙ্গা। নাই দিন্—তথাপি প্রার্থনায় যে কত লাভ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রার্থনা আমাদের প্রাণ, প্রার্থনা আমাদের জীবন, প্রার্থনা নহিলে মানুষের জীবন বাঁচে না। অতএব প্রার্থনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রার্থনা চাহেন।

রাম। আমাদের প্রার্থনায় তাঁহার লাভ ?

গঙ্গা। প্রার্থনা তাঁহার প্রিয়, প্রার্থনা তাঁহার অভিলষিত ; তিনি আমাদের প্রার্থনা ভাল বাসেন। তিনি কেন আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন ? ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি ?

রাম। কি উদ্দেশ্য, কি প্রয়োজন?

এক প্রাচীন সন্ন্যাসী বলিলেন "তাঁহার মহিমা, তাঁহার গৌরব প্রচারের জন্যই তাঁহার সৃষ্টি। গঙ্গাদেব অন্যের মীমাংসা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একটু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন ;—

কেবল মহিমা প্রচারের জন্য সৃষ্টির এত কষ্ট, পালনের এত কষ্ট স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তাঁহার সমস্ত বস্তুই পূর্ণ মাত্রায় আছে, মহিমাও তাঁহার পূর্ণ, চির প্রচারিত। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর নিকট আবার তাঁহার মহিমা প্রচার কি?—এরূপ বলিলে তাঁহাতে একটি জঘন্য প্রবৃত্তির আরোপ করা হয়। যে ব্যক্তি জগৎসংসার সৃষ্টি করিতে পারে—এই সকল সৃষ্ট জীবের নিকট তাহার কি মহিমা প্রচারের আশা থাকিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছায় জগৎসংসার ধ্বংস হয়। তবে যদি তাঁহার সমান আর কেহ থাকিত তাহা হইলে বটে আমাদের দেখাইয়া তিনি আপন শক্তির গৌরব বাড়াইতে পারিতেন। আর যদি নিতান্তই তাঁহার গুণ গায়কেরই প্রয়োজন হইত—এরূপে সংসার সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি জীবকে অনর্থক ক্লেশ দিয়া তাঁহার কি লাভ হইল? একেবারে কতকগুলি ভাল লোক সৃষ্টি করিলেই ত চলিত। আর সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অনন্তকাল তাঁহার মহিমা প্রচারের প্রয়োজন হয় নাই; এখনই বা কেন হইল? তখন তিনি কোথায় ছিলেন, কি করিতেন, কিরূপে তাঁহার মহিমা প্রকাশ পাইত? তখন যেরূপে চলিত এখনও সেইরূপে চলিতে পারে—বাস্তবিকও চলিতেছে। যদি বল তখন তাঁহার মহিমা প্রকাশের কোন উপায় ছিল না—তাহা হইলে তখন তাঁহার এই বিষয়ে অভাব ছিল, সুতরাং দুঃখও ছিল; তবে তিনি সামান্য সৃষ্ট জীবের ন্যায় সুখদুঃখভাগী।—বস্তুতঃ সেজন্য তাঁহার সৃষ্টি নয়—আমাদের প্রার্থনা শুনিবার জন্যই তাঁহার সৃষ্টি।

আমার সংস্কার ছিল, যাহারা ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তাহাদেরই ধর্ম্মোপদেশ দিবার অধিকার। কারণ, উপদেশ না দিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। তদ্ভিন্ন আত্মবঞ্চক দ্বিজিহ্ব ধূর্ত্তেরাও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকে। গঙ্গাদেবের উভয় ধর্ম্মই কিয়ৎপরিমাণে আছে বলিয়া বোধ হইল।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগজীবন বলিল—

"একঃ কপোতপোতঃ শতশঃ শ্যেনাঃ ক্ষুধাভিধাবন্তি।

অম্বরমাবৃতিশূন্যং হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা॥"

আমি বুঝিলাম যোগজীবন মনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। বড় বিরক্ত হইলাম। বলিলাম "যোগজীবন তোমার মুখে ওরূপ কথা শুনিতে ভালবাসি না।"

যোগ। ভাল না বাস, তথাপি বলিব। সহস্রবার বলিব। তুমি বড় দম্ভ করিতে—তুমি কোন প্রকার মায়ার বশ নও।

আমি। যোগজীবন, বাস্তবিক সে দম্ভ আমার গিয়াছে: তাহাতে দুঃখিতও নহি। আমি যে সুখ ও শান্তির অন্বেষণে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভ্রমিতে ছিলাম, এখন তাহার উদ্দেশ পাইয়াছি। বুঝিয়াছি, পৃথিবীতে কেবল একমাত্র প্রণয় মনুষ্যকে সুখী করিতে পারে। প্রকৃত প্রণয় কি পদার্থ তাহা এতদিনে জানিয়াছি।

যোগ। প্রণয় কি পদার্থ তাহা জানিতে পার নাই; কন্দর্পশায়কের মহিমা বুঝিয়াছ?

আমি। যোগজীবন, একটু সাবধান হইয়া কথা বল। আমাকে এরূপ কথা বলিতে তোমার অধিকার নাই।

যোগ। অধিকার আছে বলিয়াই বলিতেছি।

আমি। অধিকার আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি না।

যোগ। তুমি দেখিতে না পাও, আমি দেখিতেছি।

আমি। যোগজীবন, অনর্থক বাগবিতণ্ডার আবশ্যক নাই। যখন তুমি অনায়াসে আমাকে অসদভিপ্রায়েকলঙ্কিত করিতেছ, তখন আমি তোমাকে আর প্রকৃত বন্ধু মনে করি না।

যোগ। করিবে কেন?—তোমার দোষ নাই; দেবতারা আমোদ দেখিবার

জন্য রমণীরূপ বিবাদফল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রাণী এই ফলের অন্তর্নিহিত বিষে বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়াও লোকে আগ্রহ সহকারে সেই ফলের আস্বাদনে লালায়িত।

আমি। না হয় আমি ধ্বংস হইব। তোমার বক্তৃতার আবশ্যক নাই।

যোগ। আবশ্যক আছে। তুমি জান—আমি কে?

আমি। কে?

যোগ। আমি তোমার বালবিবাহিতা পত্নী যোগমায়া। শৈশবে অগ্নির সমক্ষে তোমার পিতার অনুরোধে পিতা যাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন—আমি সেই যোগমায়া। তুমি যাহার জন্য গৃহত্যাগী, যাহাকে কখন ভাল বাসিতে পারিবে না, সেই যোগমায়া আজিও তোমার সঙ্গ ছাড়ে নাই। তুমি যে দিন বলিলে চিরকালের মত গৃহত্যাগী হইবে, আমিও সেইদিন ভাবিলাম তোমাকে বিপদের মুখে ভাসাইয়া দিয়া ঘরে থাকিব না। গোপনে তুমি সন্ন্যাসের উপকরণ আনাইলে, আমিও আনাইলাম। তুমি বাটীত্যাগ করিলে, আমিও করিলাম। তুমি সন্ন্যাসবেশ ধরিলে না, আমি ধরিলাম। কাশীতে আসিলে, আমিও আসিলাম; দুই চারি দিন দেখা হইল, চিনিলে না; আমার আতঙ্ক দূর হইল। তুমি শেষে কাশী ছাড়িয়া রাজার আশ্রয় লইলে; আমি আর কি লইয়া কাশীতে থাকিব; আশ্রমে আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম; আমার ভাগ্যক্রমে তাহা জুটিল। রামটহল যখন আমাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, তখন ভয় হইয়াছিল। পাছে, তোমারে সঙ্গচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু তাহার পাপমন অন্যদিকে গেল, আমিও বাঁচিলাম।

আর অধিক পরিচয় আবশ্যক নয়। এখন বুঝিলে তোমাকে বলিতে আমার কি অধিকার। প্রণয়ের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে আমার প্রণয়েরও মহিমা বুঝিতে। সেই জন্যই বলি, তুমি কন্দর্পের দাস।

আর আমি তোমাকে ভয় করি না। তুমি আমার আশালতা ছিঁড়িয়াছ। তুমি আমাকে ভাল বাসিতে বা দেখিতে পারিতে না, কথা কহিতে না, তাহাতে আমার বিশেষ দুঃখ হইত না। আমি জানিতাম, তুমি আমার ভিন্ন আর কাহারই নও। এখন আর তুমি আমার নও। এখন আমার জীবন বন্ধনের

মূলতন্তু ছিঁড়িয়াছে। আজ যমুনাপ্রপাতে আমার দেহপতন হইবে; এখন আর তোমার মুখ চাহিব কেন?

আমি কথা কহিতে পারিলাম না। রক্তস্রোত প্রবল বেগে মস্তকে উঠিতে লাগিল; বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর যোগমায়া বলিল—"জীবিতেশ্বর, আমার ইষ্টদেব, আমি তোমারই আরাধনার জন্য সন্ন্যাস লইয়াছিলাম। রমণীর ছার জীবন তোমার সুখের অন্তরায় কেন হইবে। তুমি সুখী হও। আমি জন্মশোধ বিদায় হইলাম। ইহ জন্মে তোমাকে না পাই, আমার স্থির বিশ্বাস আছে, পরলোকে তুমি আমারই।"

যোগমায়া ছুটিল, আমিও চকিতভাবে নীরবে তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। যোগমায়া পরাস্ত হইল, কিয়দ্দূর আসিয়াই আমি তাহাকে ধরিলাম।

যোগমায়া বলিল "কি চান?"

আমি। যোগ, আমাকে ক্ষমা কর। আমি অতিশয় পাপী, নিতান্ত পাষণ্ড। আমি তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই।

যোগ। এখন বুঝিয়া থাকেন, সে আমার সৌভাগ্য; এখন আমাকে ছাড়িয়া দিন্। আমি আর আপনার নিকট মুখ দেখাইব না। জীবনের মমতা আমার কিছুমাত্র নাই। আমি রাগ বা অভিমানবশে মরিব না। আপনি সমদুঃখসুখ সহচরী পাইলেন। বিপদে সম্পদে সে আপনার রক্ষক হইল। আর আমার বাঁচিবার আবশ্যক নাই; তাহার হস্তে আপনাকে দিয়া আমি এ ক্লেশকর শরীর বিনাশ করিব।

"যোগ, যোগ, যোগমায়া—" আমি মুগ্ধ হইয়া যোগমায়ার পদতলে পড়িলাম। যোগমায়া ব্যস্তভাবে আমার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। এতদিনের পর বুঝিলাম "আমার স্ত্রী কি পদার্থ।"

অনেক ক্ষণের পর আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহে আসিয়া যোগজীবন বলিল "স্বয়ং ঘটকালী করিয়া আপনার বিবাহ না দিয়া আর আমার মরা হইল না।"

ইহার তিন দিবস পরে আমি যোগজীবনকে বলিলাম "রাজা তাঁহার এক

মাত্র কন্যা পাইলেন। তাঁহার স্বর্গযাত্রা বোধ হয় শেষ হইল। চল, আমরাও দেশে ফিরিয়া যাই।”

যোগ। আমাকে সে অনুরোধ করিবেন না। আমি কখনই আর গৃহে ফিরিব না। আপনি দেশে যান; আমি এই আশ্রমেই থাকিব; না হয় হিমালয়ের আরও দূরতর শৃঙ্গে গিয়া আশ্রয় লইব। দেশের মমতা, ঘরের মায়া একবারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। সে গৃহের সুখভোগ যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আর সেখানে মুখ দেখাইতে পারিব না।

আমি অনেক বুঝাইলাম; নিষ্কারণ লজ্জা তাহাকে বুঝিতে দিল না।

আমাদের কথোপকথন হইতেছিল, দেবীপ্রসাদ আসিলেন; যোগজীবন বলিল “আপনি কি কাশীতে ফিরিয়া যাইবেন?”

রাজা। কেন?

যোগ। এখন মনিয়াকে লইয়া পুনর্ব্বার সংসারী হইবেন কি না জানিতে অভিলাষ করি।

রাজা। সংসার কোথায়—আমি কে? কোথায় যাইব? না—এ পৃথিবীতে আর থাকিবার আবশ্যক নাই। আমি স্বর্গে গিয়া চিরসংসারী হইব। তারাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। সেখানে তারার জননীর সহিতও সাক্ষাৎ হইবে। স্বর্গ ভিন্ন আর কোথাও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই।

আর কিছুদিন হিমালয়-ভ্রমণ ও ক্লেশভোগ রাজা ও যোগমায়া উভয়েরই পক্ষে আবশ্যক ভাবিয়া আমি কোন আপত্তি করিলাম না।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রৌদ্রতাপে হিমালয়ের তুষারসংঘাত গলিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগনদী-সকল পূর্ণাবয়বে তীব্রবেগে ছুটিল। হিমালয়ের পথগুলি একটু উন্মুক্ত হইল। আমরাও গঙ্গাদেবের নিকট বিদায় লইয়া ২৮ শে বৈশাখ আশ্রমত্যাগ করিলাম। এখন অবধি আর ঘোড়ায় যাইবার উপায় নাই। আমরা মহাপ্রস্থান অবধি যাইবার জন্য ছয় জন লোক ভাড়া করিলাম। তাহারা ভার মাথায়

করিয়া অগ্রসর হইল। আমরা তাহাদের পশ্চাৎ পদব্রজে চলিলাম। রামটহলের যমুনোত্রি-সহচর দুই নূতন মহান্ত স্বর্গকামনায় আমাদের সঙ্গী হইল। আশ্রম ত্যাগের পূর্ব্বদিন আমরা পূর্ব্বমত মোহর ও নোটগুলি ভাগ করিয়া দৃঢ়রূপে কোমরে বাঁধিলাম।

পর্ব্বতের উচ্চশিখরে উঠিতে আমাদের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সকলেরই শরীরে রুধিরবিন্দু ধারা বাঁধিয়া প্রকাশ পাইল। মস্তক ঘূর্ণ্যমান ও নিশ্বাস ফেলিতে ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাসপতনে এবং বিষাক্ত গ্যাসের ন্যায় অতি রুক্ষ, শুষ্ক শীতল বায়ুর স্পর্শে আমরা সেদিন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

পরদিবস অপরাহ্ণে আমরা এক অনতিপ্রশস্ত নগনদীর পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। নদী আমাদের প্রায় দুই শত হাত নীচে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের অন্ধকারময় গুহা ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। তাহার রজতময় জল পাষাণে আছড়াইয়া পড়িতেছে, ফেণপুঞ্জ মাথায় লইয়া লাফাইতেছে।

জলের প্রায় দেড় শত হাত উপরে রজ্জুময় সেতুর উপর দিয়া আমাদের পথ। চারি পাঁচ গাছি মোটা দড়ী একত্র বাঁধা ; তাহার একটু উপরে দুই গাছি দড়ী পারগামীদিগের অবলম্বনস্বরূপে টাঙ্গান রহিয়াছে। তিন চারি জন লোক একবারে এই সেতুর উপর দিয়া পার হইতে পারে। এক এক বারে কে কে নদী পার হইবে, রামটহল তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল ; ধ্বজাধারী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনিয়াকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে সেতুর উপর উঠিলেন; শম্ভুজি ও আমাদের এক ভারবাহক তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। তাহারা পরপারে উপস্থিত হইলে রাজা, যোগজীবন ও আমি দড়ীর উপর উঠিলাম। আমরা ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়াছি, সহসা আমাদের অবলম্বন রজ্জু অত্যন্ত চঞ্চল হইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! শম্ভুজি আমাদের অবলম্বন রজ্জু কাটিতেছে। আকস্মিক ভয়ে প্রাণ শুখাইয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিলাম—যোগ,যোগ, বসিয়া পড়, দড়ী ছাড়িয়া দাও;—বলিতে বলিতে আর এক ব্যাপার। ভারবাহকেরা স্থিরভাবে শম্ভুজির পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল ; মনিয়া তাহাদের একের হস্ত হইতে বৃহৎ যষ্টি কাড়িয়া লইয়া সবলে শম্ভুজির মস্তকে

মারিল। শঙুজি অমনি ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় নদীগর্ভে পড়িয়া গেল! আমাদের এক ভারবাহক ঠিক সেই সময়ে মনিয়ার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারিল। লাঠি মনিয়ার স্কন্ধে পড়িল, অমনি আহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় ফিরিয়া মনিয়া আততায়ীর দক্ষিণ হস্তে যষ্টিপ্রহার করিল। ভারবাহকের হস্তস্থিত যষ্টি পড়িয়া গেল। ধ্বজাধারী তীরবেগে আসিয়া সেই যষ্টি গ্রহণ করিলেন। দুই ভারবাহকই দেখিতে দেখিতে ভূতলশায়ী হইল। এই সময়ে মনিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বলিল—"শীঘ্র এস, শীঘ্র এস।" তাহার কথায় চকিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলাম। সর্ব্বাগ্রে যোগজীবনের প্রশান্ত সহাস্যবদন। তাহার পশ্চাতে নদীতীরে—কি সর্ব্বনাশ! রামটহল ও তাহার সঙ্গী মহান্তেরা আমাদের দড়ীর সেতু কাটিতেছে! দেখিতে দেখিতে সেতু ছিন্ন হইল—অবলম্বন রজ্জু ছিন্ন হইল—আমরা পড়িতেছি, মনিয়ার "দড়ী ধর, দড়ী ধর" এই উচ্চ চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল; তাহার পর কি হইল জানি না।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

কতক্ষণ অজ্ঞান-অবস্থায় ছিলাম, বলিতে পারি না। ক্রমে অত্যুচ্চ ঘোর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিসের শব্দ বুঝিতেছি না। কি অবস্থায়, কোথায় রহিয়াছি, কিছুই স্মরণ নাই। দুই একবার চক্ষু চাহিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। অর্দ্ধনিদ্রিতের ন্যায় কেবল শব্দ শুনিতেছি; শরীর যেন উপরে উঠিতে লাগিল—ক্রমেই উপরে, উপরে, আবার নীচে নামিল। হাত নাড়িবার চেষ্টা পাইলাম, মনে করিলাম, হাত উঠিল; উঠিয়া বসিলাম; দাঁড়াইলাম; দেবীপ্রসাদের আশ্রমে, কাশীতে, তখনি আবার কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে লাগিলাম;—অস্থির মনে ভ্রমিতেছি—কারণ জানি না। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে গেল। তখন বুঝিলাম, হাতও নড়ে নাই, উঠিতেও পারি নাই; যেমন ছিলাম, সেইরূপেই আছি। আবার চক্ষু চাহিতে চেষ্টা;—এবার চক্ষু উন্মীলিত হইল। কোন দিকে কিছু নাই—অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার!

তড়িতের বেগে পূর্ব্ববৃত্তান্ত মনে আসিল। রাত্রির অন্ধকারে বুঝি কিছু দেখিতে পাইতেছি না;—উপরে চাহিলাম, নক্ষত্রতারাসঙ্কুল আকাশের দিকে চাহিলাম,—অন্ধকার, কেবল অন্ধকার!

তখন ভয় হইল। অন্ধকার অনেক দেখিয়াছি; বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার দেখিয়াছি, আমাদের বাটীর একটি অসূর্য্যম্পশ্য পুরাতন ঘরের অন্ধকার দেখিয়াছি; শত সহস্র বার চক্ষুর কবাট বন্ধ করিয়া অন্ধকার দেখিয়াছি; কিন্তু এ অন্ধকার সেরূপ নয়। পৃথিবীর অন্ধকার যত গাঢ়, যত নিবিড় হউক,

আলোকের অধিকার একবারে নষ্ট করিতে পারে না। নিতান্ত তরল, নিতান্ত সূক্ষ্ম আলোক সর্ব্বদা সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছে, যেথানে যত অল্প পরিমাণে থাকুক না কেন, আমাদের নেত্রতারকা তাহা চিনিয়া লইতে পারে। কিন্তু এখানে আলোকের অস্তিত্ব মাত্র নাই ;—আমি কোথায় ?

গভীর গর্জ্জিয়া আমার পাদমূলে জলস্রোত বহিতেছে, প্রতিধ্বনি সেই নিনাদ চতুর্গুণ করিয়া চতুর্দ্দিক কাঁপাইতেছে,—আমার হৃদয় কাঁপিতেছে ; —আমি কোথায় ?

প্রবলবাহিনী নদী তরঙ্গে তরঙ্গে এক গাছি তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া আমাকে এখানে—এই চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টিপথাতীত স্থানে আনিয়াছে ; প্রস্তর খণ্ডে শয়ন করাইয়া মধ্যে মধ্যে তরঙ্গাঘাত করিতেছে ; মুখে, পদে, সর্ব্বশরীরে জল সিঞ্চন করিতেছে ; আমাকে প্রাণহীন পাষাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। নদীর কোটি কোটি পাষাণখণ্ড আছে ; আমাকেও বুঝি তাহাদের সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা ; মনুষ্যের ন্যায় অপরের সর্ব্বনাশ ও প্রাণনাশ করিয়া আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা। নদী জানে না—মানুষ পাষাণহৃদয় পাইয়াছে, পাষাণ-শরীর পায় নাই। এইখানে যদিই আমার মৃত্যু হয়, দুই চারি দিন পরে আমার দেহ তাহার জলে মিশাইয়া যাইবে! অনন্তকালসমুদ্রে মনুষ্য-বুদ্বুদ এইরূপে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না!

এক রক্ষার বিষয়,—এই অন্ধকারাবৃত, জলপ্রবাহিত পর্ব্বততলে শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। সমস্ত শরীর জলে সিক্ত, একরূপ জলের উপরেই ভাসিতেছি ; তাহাতেও এই হিমালয়গর্ভে শীতে অধিক কষ্ট হয় নাই।

আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত দুর্ব্বল। চলিবার শক্তি নাই ; থাকিলেই বা কোন দিকে যাইব ? বেগবাহিনী নদী আমাকে পর্ব্বতের গহ্বরের ভিতর আনিয়াছে ; উপরে, নীচে, চারিদিকে, পর্ব্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে। এস্থান হইতে কিরূপে মুক্তি পাইব ?

হস্ত দিয়া আমার পাষাণ-শয্যার আকার ও পরিমাণ অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রস্তর অল্পপরিসর, চারিদিকেই জল। আবার ভাল করিয়া উপরে, চারিদিকে, চাহিলাম ; কোন দিকে বিন্দুমাত্র আলোক নাই। তখন নিতান্ত

বিরক্তি বোধ হইল।—যেখানে আলোকের পথ নাই, বায়ুর গতি নাই, অগ্নির অধিকার নাই—এখন কোন স্থানে নদী আমাকে আনিল ?

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উপরে হাত তুলিলাম—কিছুই নাই! সম্মুখে, পশ্চাতে—কিছুই নাই! বামপার্শ্বে হাত প্রসারিত করিলাম; প্রস্তরে হাত লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিলাম—জলের প্রায় দুই হস্ত উচ্চে প্রকৃতির প্রস্তরনির্ম্মিত বেদী। অনেক কষ্টে উপরে উঠিলাম। বেদীর পরিসর এক হস্তের অধিক নয়। কষ্টে ইচ্ছামত এক দিকে চলিলাম। বেদীর শেষ হইল; অসমান পাষাণখণ্ডসকলের অসমাপ্ত পথ পাইলাম। কিয়দ্দূর আসিলে মাংসপিণ্ডের ন্যায় কি একটা পদার্থ পাদস্পৃষ্ট হইল। আর এক পদ অগ্রসর—আবার সেই পদার্থ। সন্দিগ্ধমনে হস্তে স্পর্শ করিতে যাইতেছি,—প্রবল বহমান বায়ু শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। মাংসপিণ্ড সরিতে লাগিল। বুঝিলাম, পর্ব্বতবাসী বৃহৎকায় সর্প। ভয়ে পড়িয়া গেলাম; নীচে, পাথরের নীচে, জলে। জলের উপর—প্রস্তর জাগিয়া ছিল, মাথায় লাগিল;—আমি চেতনা হারাইলাম।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জলের গভীর গর্জ্জনে মোহভঙ্গ হইল। সেই অন্ধকার, সেই গহ্বর, সেই নদী, সেই পাষাণশয্যা। অর্দ্ধ শরীর জলে মগ্ন। সূচ্যগ্র সূক্ষ্ম প্রস্তর সকল শরীরে ফুটিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর অনেক দুর্ব্বল, একরূপ অবশ হইয়া আসিয়াছে। বুঝিলাম, এখান হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

আমার এই সময়ের মানসিক অবস্থা—ভয়, দুঃখ, নিরাশা বর্ণন করাও অসাধ্য, অসম্ভব। যে আশাদীপ এতক্ষণ আমার হৃদয়ে আলোক দিতে ছিল, যাহা দেখিয়া এত বিপদেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিলাম, নির্দ্দয় হিমালয়ের অন্ধকূপ গহ্বর আবার দেখিয়া সে দীপ নির্ব্বাণ হইল; জানিলাম, মৃত্যু উপস্থিত।

এই সময়ে একবার বাটীর কথা মনে হইল। সুখময় শৈশবের কথা, সহাধ্যায়ীদিগের কথা মনে পড়িল। পিতা মাতাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিলাম। শেষে পতিপ্রাণা সাধ্বী যোগমায়া। দুঃখে, শোকে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কে আমার সে চীৎকার, সে করুণস্বরে চীৎকার, শুনিবে? হিমালয়ের পাষাণ দেহ তাহাতে বিচলিত হইল না। আমার রোদনধ্বনি নদীর গর্জ্জনে মিশিয়া গেল।

আমার মুখ, কণ্ঠ, বক্ষ সমস্ত গাঢ় রক্তে পঙ্কিল। কতক্ষণ এই ভাবে আছি, জানিবার উপায় নাই। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কেহ আমার ন্যায় এরূপ অবস্থায় পড়ে নাই; এরূপে জীবনব্রতের অবসান কেহ করে নাই!

এরূপে কতক্ষণ আর যন্ত্রণা সহিব? অনাহারে আশু প্রাণবিয়োগ হয় না। হতাশের জীবন শীঘ্র যায় না। উদ্ধারের উপায় আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়—মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয়,—জগৎসংসার যাঁহার সৃষ্টি, যাঁহার ইচ্ছায় শত শত হিমালয় সাগরগর্ভ হইতে মস্তক উত্থিত করে—তাঁহার সাধ্য। শত শত হিমালয় তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে চূর্ণ হইতে পারে; বিশ্বসংসার তাঁহার মায়াসমুদ্রে বিম্বমাত্র। তিনি এই পাষাণভিত্তি ভেদ করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারেন। তবে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার কি অধিকার? তিনি কি আমাকে এই বিপদে রক্ষা করিবেন?—শত শত মনুষ্যকীটের উৎপত্তি ও বিনাশে তাঁহার একটি নেত্রপক্ষ্মও বিচলিত হয় না।—না তিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, বিপত্ত্রাতা। জগদীশ্বর,—তুমি দয়াময়। নিরাশ্রয় সৃষ্ট জীবের এত ক্লেশ দেখিতেছ; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নাই? যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে; নাথ, আমাকে রক্ষা কর।

প্রার্থনান্তে শরীরে নূতন বল আসিল। উঠিতে চেষ্টা করিলাম। স্রোতঃস্বতী আমার বস্ত্রাদি হরণ করিয়াছে, কিন্তু কোমরে তখনও নোট ও মোহরের বোঝা দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে; আমি বৃহৎ থলিয়াটি খুলিলাম এবং অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নদীজলে বিসর্জ্জন দিলাম। সমাজের অনুগ্রহে স্বর্ণের গৌরব, অর্থের গৌরব; বিপদের সময় কোন উপকারে আইসে না। দশ সহস্র টাকা হিমালয়ের গর্ভে নিহিত হইল।

টাকা বিসর্জ্জনের সহিত মনের অবস্থা আরও পরিবর্ত্তিত হইল। সকল আশা যাইলে হতাশের যেরূপ বলের সঞ্চার হয়, আমার দেহেও সেইরূপ নূতন বল আসিল। নদীর জল অবশ্যই কোন স্থানে পর্ব্বতের গহ্বর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে; তাহার স্রোতের সহিত ভাসিয়া গেলে হয়ত মুক্তিলাভ হইতেও পারে। তড়িতের ন্যায় এই চিন্তা মনে উদয় হইল। তাহার আনুষঙ্গিক বিপদ আমার সংকল্প প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

এখন আর বিপদে আমার কি অধিক ভয়!—নদীর জলে দেহ ভাসাইলাম। বেগবাহিনী স্রোতস্বতী তৃণের ন্যায় আমাকে লইয়া চলিল। আমার কেবল শরীর ভাসাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কতবার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে বাধা পাইলাম, কতবার হস্ত দিয়া কষ্টে তাহা অতিক্রম করিলাম। কতবার গুরুতর আঘাতে হতজ্ঞানপ্রায় হইলাম, ডুবিতে ডুবিতে আবার ভাসিলাম—কিন্তু সংকল্প ছাড়িলাম না। আমি প্রতি ঘণ্টায় অন্যূন পাঁচ ছয় ক্রোশ নীত হইতে ছিলাম। বেগ-গমনে দুই একবার ইন্দ্রিয়-বৈকল্যও ঘটিয়াছিল।

ক্রমে জলের গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। ভয়ানক ঘোর শব্দ ও জলমজ্জনে শেষে অবশদেহ হইয়া মগ্নপ্রায় হইলাম; এই সময়ে একবার জলের একটু উপরে মুখ তুলিয়া দেখিলাম। মনে করিলাম, জন্মের মত বায়ু ও আকাশের সহিত সম্বন্ধ ফুরাইল। একবার চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া লইলাম, সতৃষ্ণ-নয়নে সম্মুখে চাহিলাম—আঃ আলোক, আলোক! হিমালয়ের ছিদ্র দিয়া অনেক দূরে সম্মুখে আলোক আসিতেছে, দেখিতে পাইলাম; অমনি এক প্রকার অব্যবস্থিত আশা মনে উদয় হইল। বাঁচিবার সম্ভাবনা উপস্থিত দেখিয়া মৃতপ্রায় দেহে পুনর্ব্বার বল সঞ্চার হইল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া জলের উপর ভাসিয়া রহিলাম। ক্রমেই জলের-বেগ-বৃদ্ধি, ক্রমেই অধিকতর ঘোর শব্দ, যেন শত সহস্র কামান একবারে ধ্বনিতেছে। জলের টান আরও বাড়িল। আমাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া নদী নামিতেছে, স্পষ্ট অনুভব করিলাম। নিকটেই জলপ্রপাত! একখণ্ড বৃহৎ পাষাণে শরীর ঠেকিল; ধরিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না—ভাসিয়া গেলাম। আবার প্রস্তরে মাথা লাগিল, সর্ব্বশরীর বজ্রাহত হইল; আমি ডুবিলাম।

যখন চক্ষু চাহিলাম, তখন বোধ হইল, তিন চারি জন লোক আমাকে ঘেরিয়া আছে। আমার মুখের ভিতর কণ্ঠভেদ করিয়া অল্প কঠিন কি পদার্থ রহিয়াছে। মুখ নাড়িতে পারিলাম না, আর চাহিয়া থাকিতেও পারিলাম না। যেন ঘোর নিদ্রা আসিয়া আবার আমার চৈতন্য হরণ করিল।

এক প্রকার অত্যুগ্র গন্ধে আবার চক্ষু চাহিলাম। সম্মুখেই দীর্ঘাকার রক্তমুখ সাহেব। সহসা এই স্থানে সাহেব দেখিয়া চকিত হইলাম। তিনি আমাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। অনেক ক্ষণের পর শরীর একটু সুস্থ হইল। সাহেব সঙ্কেতে বলিলেন, আর কিছু খাইবে? আমি বলিলাম "না।"

সাহেব ইঙ্গিতে আরও দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। আমি সকল কথা বুঝিলাম না; শেষে বলিলেন, তুমি ইংরাজি জান?

আমি পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলাম "জানি।" তিনি আমার শরীরে বেদনাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার নির্দ্দেশানুসারে বেদনাস্থানগুলিতে ঔষধ লেপন করিয়া স্থানে স্থানে বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাকে উঠাইয়া লইবার জন্য সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে সঙ্কেত করিলেন। অল্পক্ষণ পরে আমি দেবদারু বনের মধ্যবর্ত্তী এক কুটীরে নীত হইলাম। ঔষধের প্রভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রাতঃকালে সাহেবের উচ্চস্বরে জাগরিত হইলাম। সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা; ফুলিয়া দেহের আয়তন দ্বিগুণ হইয়াছে। সাহেব আমার শরীর পরীক্ষা করিতে ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম—"অস্থি ভাঙ্গিয়াছে?"

"অস্থি ভাঙ্গে নাই, মাথা কাটিয়াছে; জলে ছিলে বলিয়াই বাঁচিয়াছ।"

সাহেব ঔষধাদি দিয়া চলিয়া গেলেন। পার্শ্বে দুই তিনটি লোক বসিয়া ছিল। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সাহেব কোথায় গেলেন?"

সে বলিল "বাসায়—তিনি নিকটেই থাকেন; রাত্রিতেও একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন।"

আমি। আমি কাহার বাটীতে আছি?

উত্তর। আমারই বাটীতে।

আমি। তোমরা আমাকে কিরূপে পাইলে?

উত্তর। আমি মন্দাকিনীর পূজা করিতে ঝরণার নিকট গিয়াছিলাম। তুমি মৃতের ন্যায় ভাসিয়া গহ্বরের বাহিরে আসিতে ছিলে। সাহেব ঝরণার উপর দাঁড়াইয়া জল দেখিতেছিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া তোমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি জলে পড়িয়া তোমাকে তুলিলাম; তাহার অনেকক্ষণ পরে তুমি চক্ষু চাহিলে।

আমি কাতর নয়নে আমার জীবনদাতার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলাম। গৃহস্বামী সঙ্গীদিগকে বসিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অনেক ক্ষণের পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজি কি বার?

একব্যক্তি উত্তর করিল—"শুক্র।"

মঙ্গল বার অপরাহ্লে আমরা নদীসাৎ হই; দুই দিন, দুই রাত্রি হিমালয়গর্ভে অতিপাতিত হইয়াছে।

আমি। এস্থানের নাম কি?

উত্তর। মহাপ্রস্থান।

শুনিয়াই হৃদয়ে বিস্ময়, ভয়, হর্ষ, ও দুঃখে মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কষ্টে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের পর আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এখান হইতে যমুনোত্রি কতদূর?

"প্রায় চল্লিশ ক্রোশ—পথ বড় দুর্গম।"

আমি যে পথে আসিয়াছি, অদ্যাবধি কেহ সে পথে আসে নাই। কখন আসিবেও না!

এই সময়ে আবার সাহেব গৃহস্বামীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন; আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া ছিলাম। ঔষধ সেবন করাইয়া ও আমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের পর তিনি চলিয়া গেলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার জীবনদাতার নাম রামশুকুল। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ; মঠধারী বেদানন্দের শিষ্য। রামশুকুল গৃহস্থ। মন্দাকিনী-নির্ঝরদর্শনার্থী কদাচিদা-

গত লোকদিগের নিকট লব্ধ সামান্য অর্থ এবং পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

নিঃসম্বন্ধ হইলেও রামশুকুল সপরিবারে প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিত। সাহেব প্রতিদিন চারি পাঁচ বার আসিয়া আমাকে দেখিতেন, প্রায় সর্ব্বদাই আমার নিকট লোক থাকিত; তথাপি আমার হৃদয় শূন্য, মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। মনে হইত আমি নিতান্ত অসহায়, আমাকে দেখিবার কেহ নাই। পীড়িত হইলে পিতা মাতা যেরূপে দিবারাত্রি শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিতেন, আমার কাতরতা দেখিয়া রোদন করিতেন – সেই কথা সর্ব্বদা মনে পড়িত। আর প্রায় সকল সময়েই আমার প্রবাস ও পর্য্যটন-সহচরী যোগমায়া—তাহার সেই পবিত্র প্রণয়, সেই পবিত্র হৃদয়ের তাদৃশ পরিণাম স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে অশ্রুত্যাগ করিতাম। রামশুকুল ও তাহার পরিবারবর্গ জানিতে পারিয়া শেষে মুহূর্ত্ত কালও আমাকে একাকী রাখিয়া যাইত না।

আমার চিকিৎসক জাতিতে জর্ম্মাণ; নাম ভন বোটলিং; বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তিনি বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব সকলের আবিষ্ক্রিয়ার আশায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। রুসিয়া, তাতার, তিব্বত প্রভৃতি দেশ দর্শন করিয়া হিমালয়ে আসিয়াছেন; ভারতবর্ষ, কাবুল, পারস্য, তুরস্ক ও মিশরদেশের মধ্য দিয়া দেশে প্রতিগমন করিবেন।

সাত দিন পরে জ্বর অপনীত হইল। সাহেবের মতে আমার আর জীবনের আশঙ্কা নাই। এতদিন মৃত্যুচিন্তায় ভয় হইত। পীড়ার উপশমের সহিত সেই ভয় কমিয়া আসিতেছিল। এখন সাহেবের মুখে জীবনের আশঙ্কা নাই শুনিয়া পরিতাপ হইল। ভাবিলাম মরিলেই ভাল হইত। এখন আর কি সুখে বাচিব? আমার জীবনের আধার বিনষ্ট হইয়াছে; আমার নাশ হইল না কেন?

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সাহেব আমার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। আমি সংক্ষেপে আমার জীবনচরিতের কিয়দংশ বর্ণন করিলাম, মহাপ্রস্থান গহ্বরের ভিতরে যাইবার সংকল্পের কথাও বলিলাম;

কেবল রাজার স্বর্গযাত্রার কথা বলিলাম না। সাহেব সোৎসাহে বলিলেন— "আমি ঐ গুহার মুখ দেখিয়াছি। পরীক্ষা করিয়া বহুকালাবধি নির্ব্বাণ আগ্নেয় গিরির মুখের ন্যায় বোধ হইল। এখানকারি ভূমি ও পর্ব্বতশৃঙ্গেও স্থানে স্থানে ধাতুনিঃস্রবের চিহ্ন আছে। মন্দাকীন নির্ঝরের উভয় পার্শ্বেও উপরের প্রস্তর গলিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। ছয় রাজা ইহার ভিতর গিয়াছিল বলিয়া তোমাদের ইতিহাসে যে বর্ণনা আছে, তাহা কিছুই অসম্ভব নয়। আগ্নেয় পর্ব্বতের যে স্থান দিয়া ধাতুনিঃস্রব বাহির হয়, কোন কোন পর্ব্বতের সেই পথে অনেক দূর, এমন কি, পৃথিবীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে। এই পথ দিয়া যখন তোমাদের দেশের ছয় লোক গিয়াছিল, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই পথ দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করা যাইবে। আমারও ইচ্ছা হইতেছে, ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করি। আর যখন তোমাদের দেশীয় ছয় লোক ইহার ভিতর যাইতে সাহস করিয়াছিল, তখন আমি না যাইলে আমার কাপুরুষতা ও আমার জাতির কলঙ্ক হইবে।"

সাহেবের কথা শুনিয়া হাসা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সাহেব বলিলেন—তোমরা এখন নিতান্ত অসার হইয়া পড়িয়াছ—তাই আমার কথায় হাসিতেছ। তোমাদের দেশ সম্বন্ধে তোমরা যাহা জান না, জানিতে চাহ না, বুঝনা, বুঝিতে চাহ না, আমরা তাহা জানি; যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। দেখ হিমালয় তোমাদের দেশের পর্ব্বত। এখানে আগ্নেয় গিরি আছে, অদ্যাবধি তোমরা তাহা জানিতে না। দেখিতেছি, আমিই ইহার আবিষ্কর্ত্তা হইলাম।

সাহেবের কথায় আমার কৌতুক জন্মিল। ক্ষণকালের জন্য মানসিক বেদনা ভুলিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সাহেব বলিলেন—মহাপ্রস্থানের ভিতর দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে লোকসমাজেরও অনেক উপকার হইবে। পৃথিবীর অভ্যন্তর কোন্ কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত—জানিতে পারা যাইবে। এত দিনে বিজ্ঞানের ভ্রম প্রমাদ সকল বাহির হইবার উপায় হইল।—যে ছয় রাজা গুহার মধ্যে গিয়াছিল তাহাদের নাম কি?

আমি। তাঁহাদের ছয় জনই রাজা নহেন; এক জন হস্তিনার রাজা, চারি জন তাঁহার ভ্রাতা—

সাহেব। হাঁ হাঁ—তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন। তোমরা ইতিহাসের মর্ম্ম ও প্রাচীন জাতিসমূহের অভিপ্রায় বুঝিতে পার না। তোমাদের দেশে বিদ্যাবুদ্ধিবলে যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিতেন, তাঁহাদের সকলকেই রাজা বলিত। আমি দেশে ও ইংলণ্ডে শুনিয়া ছিলাম—এদেশের লোকেরা পুরোহিতদিগকে মহারাজা অর্থাৎ বড় রাজা বলে; তাহার কারণ, তোমাদের পুরোহিতেরাই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। যে ছয় লোক মহাপ্রস্থান, দিয়া বিজ্ঞানের উন্নতি কামনায় পৃথিবীর ভিতর গিয়াছিল, তাহারাও পুরোহিত; সেই জন্য তাহাদের নাম রাজা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে এক স্ত্রীলোক ছিল। বুদ্ধিবিদ্যাবলে সেও রাজা উপাধি পাইয়াছে। তাহাদের নাম কি? সাহেব একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া লিখিতে লাগিলেন— যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব ও দ্রৌপদী।

সাহেব। কোন সময়ে গিয়াছিল?

আমি। তাহার নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন।

সাহেব। ভাল, খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে—

আমি। তাহার অনেক পূর্ব্বে।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, গ্রীকদিগের আক্রমণের সময় হিন্দুরা এক রূপ অসভ্য ছিল। যদিও গ্রীকেরা এদেশের লোকদিগকে সভ্যতার পথ দেখাইয়া যায়, তথাপি সেই ঘটনার পর অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর গত না হইলে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান বিষয়ে এতদূর উন্নতি হইতে পারে না যে বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বান্বেষণে তাহারা এই ভয়ানক গহ্বরে প্রবেশ করিবে।

আমি। সে যাহাই হউক, তাঁহারা স্বর্গকামনায় মহাপ্রস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

সাহেব। প্রাচীন হিন্দুরা বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবী ছিল। কিন্তু তাহাদের সন্তানদিগের বুদ্ধির অভাব দেখিয়া দুঃখ হয়। প্রাচীনদিগের কথার মর্ম্ম বোধেও তোমরা সমর্থ নহ। তোমরা নিতান্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী। গ্রন্থে

যাহা লেখা থাকে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টাও তোমাদের নাই। স্বর্গে যাইলে অমর হয়। বিজ্ঞানের কোন অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাও অমর। তোমাদের ছয় রাজা সেই অমরতা-কামনায় মপস্থানের ভিতর গিয়াছিল; আমরাও যাইব।

আমি মনে করিলাম, এসময়ে রাজা দেবীপ্রসাদ থাকিলে ভাল হইত। তিনি যেমন গর্দ্দভ-চূড়ামণি যুধিষ্ঠির, তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন বৃকোদর জুঠিয়াছে।

সাহেব। হয়ত আমরা শেষে পৃথিবীর মধ্যস্থানে উপস্থিত হইব।

আমি। পৃথিবীর মধ্যস্থানে যাওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই স্বীকার করেন, ভূমির নিম্নে প্রতি ৪৬ হাতে এক ডিগ্রী করিয়া উত্তাপ অধিক। ইহাতে পৃথিবীর মধ্যস্থানে কিরূপ উত্তাপ হওয়া সম্ভব, তাহা—

সাহেব। আজিও কেহ পৃথিবীর ভিতর গিয়া দেখে নাই। সমস্তই অনুমান মাত্র। ভিতরে যদি বাস্তবিকই এত উত্তাপ হইত, তাহা হইলে পৃথিবী শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও; তাহার পর গুহা মধ্যে প্রবেশ করা যাইবে।

আমি। আমার মহাপ্রস্থানের ভিতর যাইবার অভিলাষ নাই।

সাহেব। কেন?—তুমি জান না ইউরোপে বৈজ্ঞানিকদিগের কত আদর, কত সম্মান। চল, তুমিও আমার পরিশ্রমের, আমার পুরস্কারের ভাগী হইবে; পৃথিবীতে অক্ষয় যশ লাভ করিবে।

আমি। আমরা সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী; যশ ও সুখ্যাতির প্রত্যাশা রাখি না।

সাহেব। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ কর। পৃথিবীর উপকারের চেষ্টা কর। সন্ন্যাসীরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, নিতান্ত স্বার্থপর। পৃথিবীর শস্যে উদর পূর্ণ করিয়া কেবল আপনাদের সুখকামনায় বিব্রত। তাহাদের দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই। তুমি এখন পীড়িত। সুস্থ হও; তাহার পর শিক্ষা দিয়া তোমাকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিব।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এক এক দিন করিয়া দেড় মাস অতীত হইল। আমার চিকিৎসক সাহেব প্রায়ই দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে গিয়া দুই চারি দিনের পর ফিরিয়া আসিতেন। আজি আসিয়া বলিলেন "তুমি প্রায় সুস্থ হইয়াছ; এখন আপনার চিকিৎসা আপনি করিতে পারিবে। আমি এই সময়ে গঙ্গাবত্রি (গঙ্গোত্রি) ও হরিদ্বার দেখিয়া আসি। ফিরিয়া আসিতে এক মাসের অধিক লাগিবে না। তাহার পর তোমাকে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রবেশ করিব।" সাহেব ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ও নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর অসামান্য যত্নে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলাম। একদিন রামশুকুল আসিয়া বলিল—"কাল এখানে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; তিনি পাণ্ডবদিগের ন্যায় মহাপ্রস্থান দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে চান। বেদানন্দস্বামী এ প্রস্তাবের প্রতিরোধী। কাল রাত্রি অবধি এবিষয়ে ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হইতেছে।

শুনিয়াই প্রথমে মন উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইল। মনে করিলাম, রাজা দেবীপ্রসাদ মৃত্যুর হস্তে রক্ষা পাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার মনে হইল, রাজার অদ্যাবধি জীবিত থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই; অন্য কেহ রাজার ন্যায় স্বর্গ কামনায় উন্মত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছে। পৃথিবীতে এরূপ লোকের অভাব নাই।

সামর্থ্য থাকিলে তখনই গিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতাম। মন নিতান্ত চঞ্চল হইল—নানা প্রকার ভাবিয়া স্থির করিলাম, নবাগত সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আমাদের রাজা দেবীপ্রসাদ। আহারাদি সমাপন হইবামাত্র আমি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে রামশুকলকে সন্ন্যাসীর নিকট পাঠাইলাম। আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আমার আবাস গৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিয়া দিলাম। রামশুকুল সন্দিগ্ধমনে সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিল।

নিতান্ত সন্দিগ্ধ মনে পথ চাহিয়া আছে, রাজা দেবীপ্রসাদ গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আমি উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; আবেগ এত প্রবল হইল, আমি একটিও কথা কহিতে পারিলাম না; রাজা কি বলিলেন, তাহাও বুঝিলাম না।

অনেক ক্ষণের পর চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া আমার বিপদ ও দুঃখের কথা রাজার নিকট বর্ণন করিলাম। দেবীপ্রসাদের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। তিনি যোগজীবন, মনিয়া বা ধ্বজাধারী কাহারই কোন সংবাদ জানেন না; জলে পড়িয়া তিনিও আমার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলেন; আমার ন্যায় তিনিও পাষাণ শয্যায় চৈতন্য লাভ করেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। ক্ষত বিক্ষত শরীরে সেই অবস্থায় তাঁহার রাত্রি অতিবাহিত হয়। শেষে এক কৃষক দয়া করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যায়। প্রায় এক মাস শয্যাগত থাকিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন। ইহার মধ্যে ধ্বজাধারী ও মনিয়ার অনেক অন্বেষণ হইয়াছিল; কোন সন্ধান হয় নাই; শেষে তাহাদের পুনর্দ্দর্শনের আশা ত্যাগ করিয়া, ঐহিক-সুখে বিতৃষ্ণ দেবীপ্রসাদ তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গগমনকামনায় মহাপ্রস্থানে আসিয়াছেন।

আমি শোকার্ত্ত স্বরে বলিলাম, তবে যোগজীবন নিশ্চয়ই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

রাজা। যোগজীবন নিশ্চয়ই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। দুরাত্মা রামটহল নিশ্চয়ই আমার মনিয়াকেও বিনষ্ট করিয়াছে। তাহারা অগ্রেই স্বর্গে গিয়াছে। চল, সেই খানেই তাহাদের সকলের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইবে।

আমি কাতর ভাবে বলিলাম, আপনি নরপিশাচ রামটহলকে অধিক বিশ্বাস করাতেই এই সর্ব্বনাশ হইল; মনিয়া ও যোগজীবনকে একবারে হারাইলাম।

রাজা। আর সে নরাধমের নাম করিওনা, এখন আর সে সকল চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই, তাহার স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই হইবে।

রামউকুলের অনুরোধে দেবীপ্রসাদ তাহার বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রায় দেড় মাসের পর বোটালিং গঙ্গোত্রি, হরিদ্বার, মানোরি জ্যোষি মঠ, বদরী-নাথ, নীতিপথ, মানস সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলেন।

হিমালয়ে পর্যটন করিয়া তাঁহার মহাপ্রস্থান দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশের ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়াছিল; তিনি আসিয়াই এই মহদভীষ্ট সাধনের প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সঙ্গীর প্রতি সন্তুষ্ট না হইলেও দেবীপ্রসাদ—চণ্ডালেরও ধর্ম্মবুদ্ধি হওয়া সম্ভব, আর ধর্ম্মবুদ্ধি হইলে তাহারও সর্গ লাভ হইতে পারে—স্থির করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গ যাত্রায় স্বীকৃত হইলেন।

যোগমায়ার মৃত্যু নিশ্চয় হওয়া অবধি আমি জীবনে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হইয়াছিলাম। ভূগর্ভে প্রবেশই আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া আমি আর কোন প্রকার আপত্তি করিলাম না। আমাকে মহাপ্রস্থানপ্রবেশে সম্মত দেখিয়া সাহেব হাসিয়া বলিলেন—পীড়িত হইলে শরীরের ন্যায় মনও দুর্ব্বল হয়। সেই কারণেই তুমি পূর্ব্বে আমার প্রস্তাবে অসম্মতি দেখাইয়া ছিলে; ক্লেশের ভয় করিলে সম্মান ও খ্যাতি লাভ হয় না। পৃথিবীর কোন প্রকার উপকার সাধনও অসম্ভব।

সাহেবের কথায় একটু বিরক্তি জন্মিল; হাসিও আসিল। বলিলাম, আলোক ও বায়ুর গতিশূন্য স্থানে আপনার পরীক্ষা বিলক্ষণ হইবে। সেখানকার রুদ্ধবাষ্প স্থানে মশাল জ্বালিলেও হয় নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, নাহয় বাষ্পরাশি অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া সমস্ত গহ্বর অগ্নিময় করিবে, আমাদিগকেও দগ্ধ করিবে।

সাহেব বলিলেন সে জন্য চিন্তা নাই। আমার নিকট রমকর্ফের কয়েল আছে; তদ্বারা উজ্জ্বল তাড়িতালোক প্রস্তুত হয়। তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই; অসামান্য রাসায়নিক রমকর্ফ ১৮৬৪ সালে এই অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের নিকট ২০ সহস্র টাকা পুরস্কার পান। ইহা ভিন্ন আমার নিকট মানোমেটর,* ক্রনোমেটর,† নিশাদর্পণ‡ ও গুহামধ্যে নামিবার ও উঠিবার উপযোগী সমস্ত উপকরণ আছে। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।

আমি তখনও নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া বোটলিং ও রাজা উভয়েই আর কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন।

দিন কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। প্রকৃতির স্বতশ্চল ঘটিকা যন্ত্রেরহস্ত স্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য সমান গতিতে দিবারাত্রি বেলা পরিমাণ করিতেছে,

প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর পরিবর্ত্ত হইতেছে, আমার শরীরাবস্থারও পরিবর্ত্ত হইতেছে, কিন্তু এ দোষস্পর্শশূন্য যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত নাই, সাহেবের আসার পর এক দুই করিয়া পনর দিন দেখাইয়া দিল। আমিও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। মহাপ্রস্থানের উদ্যোগও আরম্ভ হইল। পাণ্ডারা প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়াছিল; শেষে পাঁচ শত টাকা লইয়া আমাদিগকে গহ্বরে প্রবেশের অনুমতি দিল।

মহাপ্রস্থানের তিন ক্রোশ উত্তর ও পশ্চিমে এক অদ্ভুত পাহাড়ী রাজ্য আছে। প্রস্থানের দুই দিবস পূর্ব্বে সাহেব ও গঙ্গাদেবের সমভিব্যাহারে আমি সেই স্থানে বেড়াইতে গেলাম। রাজ্যের অল্পদূরে উপস্থিত হইবামাত্র দুই তীরধারী প্রহরী আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। গঙ্গাদেব তাহাদের একের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রহরীদিগের অনেক কথা হইল। অপরিচিত লোক বলিয়া তাহারা প্রথমে আমাদিগকে রাজ্যমধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত হইল; শেষে গঙ্গাদেব একখানি লোহিত প্রস্তর বাহির করিয়া দেখাইলে পথ ছাড়িয়া দিল। আমরা তাহাদের ধনুস্পর্শ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম।

প্রহরীরা চলিয়া গেলে গঙ্গাদেব বলিলেন—এই রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, কোতোয়াল, প্রহরী, কৃষক, দোকানদার, পুরোহিত, চিকিৎসক প্রভৃতি সকলেই স্ত্রীলোক; যে প্রহরীরা আসিয়া আমাদের পথ রোধ করিয়াছিল, সম্মুখে, পার্শ্বে যত লোক দেখিতেছ, সকলেই রমণী। যাহাদের শিরস্ত্রাণ ভ্রূদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারাই পুরুষ। পুরুষেরা গৃহকর্ম্ম, রন্ধন ও পশুপালন করে। এস্থানের স্ত্রীমাত্রই অস্ত্রচালন ও ধনুর্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষ। ইহারা রাজ্যমধ্যে অপর লোক প্রবেশ করিতে দেয় না; আপনারাও দেশ ছাড়িয়া ভিন্ন স্থানে যায় না; কেবল সময়ে সময়ে মহাপ্রস্থান দর্শন করিতে যায়। আমি পূর্ব্বে দুইবার এ গ্রামে আসিয়াছিলাম। অন্য লোকের মধ্যে তোমরাই বোধ হয় প্রথম এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে।

রাজ্যবাসী সকলেই সলোমপশুচর্ম্মনির্ম্মিত আবরণে স্কন্ধ অবধি জানু পর্য্যন্ত আবৃত। পদদ্বয় স্থূল চর্ম্ম ও চর্ম্মরজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ। অধিকাংশ

লোকেরই বক্ষঃ ও বাহু পর্য্যন্ত লম্বমান শিরস্ত্রাণ আছে। শিরস্ত্রাণগুলি কপালের উপর চিবুকের নিম্নে উভয় পার্শ্বে কর্ণ পর্য্যন্ত আবরণ করিয়া রজ্জুদ্বারা বদ্ধ। কেবল পুরুষদিগের শিরস্ত্রাণ ভ্রূদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। বাসগৃহ সমস্তই পাষাণনির্ম্মিত; উপরে প্রস্তরের ছাদ; প্রস্তরের সন্ধিস্থানগুলি এক প্রকার লেপনে আবরিত। সকলেরই দশ পনরটি গো, মহিষ ও ছাগ আছে। রন্ধনশালা, বাসস্থান ও পশুশালা সমস্তই এক গৃহের ভিতর। পথে প্রত্যেক স্ত্রী লোকেই প্রতিপদে আমাদের গতিরোধের প্রয়াস পাইয়াছিল; গঙ্গাদেব তাঁহার নিদর্শন প্রস্তর দেখাইয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুই তিনটি রমণীগঙ্গাদেবকে বিশেষ চিনিত, তাহারা আমাদিগকে রাজবাটীর দিকে লইয়া চলিল।

এক সুন্দরমূর্ত্তি পুরুষ পথপ্রান্তবর্ত্তী মাঠে পশুপাল মধ্যেবসিয়াছিল; আমাদের সমভিব্যাহারিণী রমণী তাহার দিকে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিল; অমনি পশুপালক মুখ নত করিয়া শিরস্ত্রাণ টানিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিল।

এক পুরুষ অনাবৃত মস্তকে এক গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সুদীর্ঘ কেশ জাল ও দীর্ঘ শ্মশ্রু সুবিন্যস্ত বেণীবদ্ধ। আমি গঙ্গাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ ব্যক্তি অনাবৃত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন?

গঙ্গা। ইহারা বারপুরুষ। স্ত্রীলোকেরা দর্শনী দিয়া ইহাদের সহিত আলাপ করিতে যায়। মস্তক ও মুখের পূর্ণ শোভা দেখাইয়া পথিকদিগের চিত্তাকর্ষণ-প্রয়াসে দাঁড়াইয়া আছে।

এক স্থলে এক মুখর পুরুষ ও এক রমণীতে বচসা হইতেছিল। রমণী বলিল, তুই সকালে, আমার গৃহে অনুপস্থিতির সময়ে, কোন স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছিলি?

পুরুষ। সে আমার বালসহচর। বিবাহের পর পিতার গৃহ হইতে আসিয়া অবধি তাহাকে দেখি নাই। আজ পথে যাইতে ছিল—আমাকে দেখিয়া দুই একটি কথা বলিয়া গেল। ইহাতে আবার আমার কি অপরাধ?

স্ত্রী। অপরাধ নয়, তুই অতি পাপিষ্ঠ; আমি বেশ বুঝিতেছি, তুই বাল্যকালে ব্যভিচারী ছিলি।

পুরুষ। দুইটি কথা বলিয়াই আমার এত অপরাধ হইল, তুমি যে প্রতিদিন কত পুরুষের সঙ্গে আলাপ কর—

স্ত্রী আরক্তনয়নে বলিল, তুই আর আমি সমান? আমরা স্ত্রীজাতি, আমাদের সব সাজে; তোরা পুরুষ স্ত্রীসেবা তোদের কাজ—

পুরুষ। আর তোমারা যাহা ইচ্ছা, করিবে—আমরা মানুষ নয়; আমাদের দুই হাত, তোমাদের চারি হাত—

স্ত্রী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, দুই হাত কি চারি হাত, তবে দেখ—বলিয়া অস্ত্র লইয়া মারিল। পুরুষ চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে পালাইয়া গেল।

গঙ্গাদেব বলিলেন ইহাদের ব্যবহার অতি চমৎকার। ইহারা পশুপালন, কৃষিকার্য্য বা ব্যবসায়ে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা স্বয়ং রাখে না। প্রতিদিন সমস্ত আনিয়া রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীদিগের নিকট জমা দেয়। রাজা প্রতিদিন প্রত্যেক প্রজার আহারীয় ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য গৃহে গৃহে পাঠাইয়া দেন। রাজ্যের মধ্যে যাহারা যত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহারা তত অধিক সম্ভ্রান্ত। সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রতিমাসে চারিদিন করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতে পায়। যাহারা যুবাবয়সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে, প্রাচীন বয়সে তাহারা রাজমন্ত্রিত্ব লাভ করে। কেবল পুরোহিতদিগের এই শেষোক্ত অধিকার নাই। রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোক ভিন্ন অপর সাধারণের তীর্থযাত্রা বা অন্য কোন উপলক্ষে রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। আট বৎসর অতীত হইল, এই রাজ্যের বৃদ্ধ রাজা তীর্থদর্শনে গিয়া আমাকে এই লোহিত প্রস্তর দিয়া আসিয়া ছিলেন। ইহার বলেই আমার এ রাজ্যে ভ্রমণ অব্যাহত। শুনিয়াছি, দুই বৎসর অতীত হইল, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

গর্ভাবস্থায় ছয়মাস ইহারা সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে বিরত থাকে। প্রসবের পর কন্যাগুলি রাজকীয় শিশুবাটিকায় নীত হয়। সেখানে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। পুত্র সন্তানদিগের লালন পালনের ভার গৃহমধ্যচারী পুরুষদিগের উপর অর্পিত আছে।

কথায়, কথায় আমরা রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলাম। সাহেব এক প্রস্তর বেদিকায় বসিয়া পুস্তকে লিখিতে আরম্ভ করিলেন; আমরা রাজসভার দিকে অগ্রসর হইলাম। পাষাণনির্ম্মিত কুটীরের সম্মুখে অনাবৃত প্রদেশে সলোম পশুচর্ম্মখণ্ড সমূহে রাজা ও সভাসদ্‌বর্গ মণ্ডলাকারে বসিয়াছেন। এক প্রান্ত দিয়া মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ। মণ্ডলের মধ্যস্থলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রক্তাক্তশরীরে দণ্ডায়মান। তাহার বিচার হইতেছিল। বৌদ্ধ রাত্রির অন্ধকারে ভ্রমক্রমে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল; প্রহরীরা প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিয়া বিলক্ষণ প্রহার পূর্ব্বক ধরিয়া রাজসভায় আনিয়াছে। বৌদ্ধ অনেক কাকুতি বিনতি করিয়া জানাইল, তাহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। রাজা ও মন্ত্রিবর্গে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া শেষে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ হইল। তখন বৌদ্ধ কহিল, প্রহরীদিগের মোকদ্দমার শেষ হইল, এখন আমার এক মোকদ্দমা আছে। ইহারা বিনা অপরাধে আমাকে প্রহার করিয়াছে; তজ্জন্য বিচার প্রার্থনা করি।

বৌদ্ধের কথায় সকলেই বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দুইচারি কথার পর রাজা বলিলেন—তোমার শরীরে রক্ত অধিক হইয়াছিল; প্রহরীরা রক্ত মোক্ষণ করিয়া তোমার উপকার করিয়াছে; তাহার প্রতিদানস্বরূপ তোমাকে চারি টিপ্‌পা দিতে হইবে।

বৌদ্ধ অগত্যা অর্থদণ্ড দিয়া বাহিরে আসিল। আমরাও রাজসভা ত্যাগ করিয়া সাহেবের নিকট আসিলাম। তাহার পর সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রস্থানের পথ ধরিলাম।

পথে আসিতে আসিতে আমি সাহেবকে সন্ন্যাসীর দুঃখের পরিচয় দিলাম। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, আমি এখনই সেখানে ফিরিয়া গিয়া এই তরবারিতে রাজাকে কাটিয়া তাহার রক্তমোক্ষণের মূল্য আদায় করিব।”

সাহেবকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া আমি বলিলাম, আমরা সংখ্যায় দুই তিন জনমাত্র; তাহাদের লোক অনেক—

সাহেব সক্রোধদর্পে কহিলেন “তুমি আমাকে জান না; পুস্তকালয় অপেক্ষা

রণাঙ্গনে আমার জীবনের অধিক সময় অতিপাতিত হইয়াছে। আমি এই অসভ্য পাহাড়িয়াদিগকে ভয় করিব ? ”

সাহেব যাইতে উদ্যত হইলেন ; অমনি বৌদ্ধ যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব বলিলেন “ এব্যক্তি কি বলে ? ”

আমি। ইহাঁদের মতে অহিংসা পরম ধর্ম্মসাধন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রার্থনা,আপনি তাঁহার জন্য জীবহিংসা না করেন।

সাহেব। এই জন্যই তোমরা বণিকজাতির ক্রীতদাস।

আমি। সামর্থ্য নাই, সেই জন্যই আমরা পরাধীন—

সাহেব। সামর্থ্য অপেক্ষা সাহসের প্রয়োজন অধিক। তোমাদের ন্যায় অপদার্থ জাতি আর নাই। তোমরা স্বর্ণক্ষেত্র হিন্দুস্থানের অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের যোগ্য নও। ইংরাজেরা হিন্দুস্থানের অর্থেই ধনবান্, এই বলেই বলবান্ ; তোমরা ইহা দেখিয়াও দেখিতেছ না ! শুনিয়াছি, অনেক ইংরাজ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এই খানে বাস করিয়াছে। সত্বরই তাহাদের হস্তে তোমাদের সমূলোৎপাটন হইবে। উঃ ! ইংরাজের ধনাশার সীমা নাই। যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় সূর্য্যের প্রভাবে এখানে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে না—তাহাদের অভিলাষ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ, উর্ব্বরভূমি সমস্ত হিন্দুস্থান একবারে উঠাইয়া স্বদেশে লইয়া যায় ! তোমরা ইহা বুঝিতেও পার না !

আমি নীরবে সাহেবের জুতা সহ্য করিলাম। গঙ্গাদেব সাহেবের উচ্চস্বর তিরস্কারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ; আমি তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের লোকদিগের নিজদোষেই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। সকল লোকে যদি ভক্তিভাবে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করে, দেখিতে পাইবে, অবিলম্বে তাহদের অরিষ্টনাশ হয়।

আমি। দেবার্চ্চনাদিতে পারত্রিক মঙ্গল হইবার কথা ; ঐহিক দুঃখনাশ ত দেখিতে পাই না।

গঙ্গা। পারত্রিক মঙ্গল আবার কি ? পরলোক চতুর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পরভাগ্যোপজীবিবর্গের জীবনোপায়, ধূর্ত্তের দুষ্টাভিপ্রায় সাধনের মন্ত্র, পৌরুষহীনের সান্ত্বনা ও আশার স্থল। চৈতন্যনাশেই দেহের নাশ, দেহের বিনা-

সেই চৈতন্যের লোপ হয়। শরীর ব্যতিরিক্ত ভিন্ন পদার্থ আত্মার কল্পনা কূটতার্কিকতা মাত্র। চৈতন্য শরীরধাতুসমূহের সংযোগজাত গুণবিশেষ। দেহের কোন অংশে সেই সংযোগের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলে, সেই সেই অংশের চৈতন্য লোপ হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর। সেইরূপ সমস্ত শরীরে সংযোগব্যতিক্রম হইলেই মৃত্যু ঘটে। দেবার্চ্চনাদিতে ঐহিক মঙ্গল হয়। আমাদের ঐহিক দুঃখ নাশ ও সুখসম্পাদনের জন্যই ঈশ্বর নানা সময়ে নানা দেবমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তিসহকারে সেই সকল মূর্ত্তির আরাধনা করিলে অবশ্যই বিঘ্ননাশ হইবে; তবে যে দুই এক স্থলে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে অবশ্যই হয় আন্তরিক ভক্তির অভাব আছে, না হয় প্রার্থয়িতা অন্যান্য কারণে ঈশ্বরের বিরাগভাজন হওয়াতে স্বীয় অভীষ্ট লাভে অনধিকারী। অথবা সেব্যক্তি যাহা কামনা করে তাহা হয়ত প্রকৃত পক্ষে তাহার মঙ্গলোত্তর নয়; কিম্বা তাহার পক্ষে মঙ্গলোত্তর হইলেও হয়ত তাহা ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টজীবের অনিষ্টসাধক। ঈশ্বর ভাবী ঘটনা দেখিতে পান—মনুষ্য দেখিতে পায় না।

মঠে ফিরিয়া আসিতে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। গঙ্গাদেবের অনুরোধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিল।

আহারান্তে রাজার সহিত সুখাসীন হইয়া বৌদ্ধ তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা মহাপ্রস্থানের কথা উল্লেখ করিলেন। বৌদ্ধ সমস্ত শুনিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল—এরূপ কাজ করিবেন না। আমাদের শাস্ত্রে মহাপ্রস্থানের উল্লেখ আছে। ইহা নরকের দ্বার। ইহার ভিতর অল্পদূর গেলেই প্রথম নরক দেখিতে পাইবেন; সেখানে কোটি কোটি নরনারী স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; অনন্ত যাতনায় জ্বলিতেছে। তাহাদের ক্লেশের অবসান নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অগ্নিশিখা চিরকাল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাহার পর দ্বিতীয় নরক। সেখানে ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু, যবন ও নাস্তিকদিগের বাস। বাল্যমৃত ও উম্মত্তদিগেরও সেই স্থান। সেখানকার ভূমি অত্যুষ্ণ-লৌহময়। সকলে উত্তাপে, তৃষ্ণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে অগ্নিময় লৌহশলাকা সকল আপনা হইতে তাহাদের চক্ষুতে প্রবিষ্ট

হইতেছে। তাহাদের ক্লেশ ও নরকবাসের অবসান আছে। যে সকল জ্ঞানী ধার্ম্মিক ব্যক্তি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিল, তৃতীয় নরকে তাহাদের স্থান। তোমাদের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সেই স্থানে ছিলেন। সেখানে অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আলোক আছে। মৃত্যুর ভীষণ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি সর্ব্বদা সেখানে বর্ত্তমান। তাহার হস্তে করাল করবাল। অগ্নিময় একমাত্র চক্ষু ললাটের মধ্যভাগে ভয়ানক ভাবে ঘুরিতেছে, ভীষণ অগ্নিশিখার ন্যায় সুদীর্ঘ জিহ্বা ওষ্ঠাধর লেহন করিতেছে। দেহে মাংস বা চর্ম্ম নাই—কেবল রক্তবর্ণ অস্থিপুঞ্জ ;—তাহার উপর নিবিড়কৃষ্ণ শিরা সকল বিস্তৃত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব অবধি এখানে আর কেহ যায় না।

বৌদ্ধের কথা শুনিয়া আমার প্রভু বলিলেন "স্বর্গের এদিকে প্রথমেই নরক আছে, তাহা আমি জানি ; রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই নরকদর্শন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা নরকের দূরবর্ত্তী কোন পথ দিয়া যাইতে পারিব। মহাপ্রস্থানের ভিতর প্রবেশ করিলেই দেবরাজ স্বয়ং আমাদের পথপ্রদর্শক হইবেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রস্থানের নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রাতঃকালে আমরা মহাপ্রস্থান গুহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সাহেব আমাদের দ্রব্যসামগ্রী তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন পাহাড়ীর স্কন্ধে তুলিয়া দিলেন। গুহামুখ গ্রামের ছয় ক্রোশ দূরে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। আমরা ভারবাহকদিগের অবলম্বিত পথে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পথ ক্রমেই অধিকতর দুরারোহ হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে অনতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল অন্য পর্ব্বতের দেহ হইতে বাহির হইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। মধ্যে মধ্যে গভীর গহ্বর সকল আমাদের সম্মুখে পথরোধ করিয়া রহিয়াছে। অনেক বার হিমানীরাশির উপর স্খলিতপদে পতিতপ্রায় হইলাম। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড সকল আমাদের পদ-

দগনে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। প্রায় প্রতিবারেই আমাদিগকেও পতনোন্মুখ করিল। বেলা দশটার পর পথের আকার আরও পরিবর্ত্ত হইল। এক পর্ব্বতের উপর সমানভাবে উন্নত আর এক পর্ব্বতের উপর দিয়া আমাদের পথ। এক পাহাড়ী ভার নামাইয়া অনেক যত্নে একটু উপরে উঠিল। তাহার পর আপনার দীর্ঘ যষ্টির এক প্রান্ত স্বয়ং ধরিয়া নীচে ঝুলাইয়া দিল। তাহার এক সঙ্গী যষ্টির প্রান্ত ধরিয়া ভারস্কন্ধে বক্রদেহে পর্ব্বতের গাত্রে পদক্ষেপ করিতে করিতে উপরে উঠিল। সেখানে ভার রাখিয়া আবার নামিল, এবং তাহার সঙ্গীর ভার লইয়া আবার উপরে উঠিল। তাহার পর তৃতীয় পাহাড়ী। তৎপরে আমরা একে একে উপরে উঠিলাম। পর্ব্বতের উপরে উঠিতে আমাদিগকে অন্ততঃ দশ বার এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে হইয়াছিল।

ভয়ানক পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর বেলা চারিটার সময় আমরা গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ীরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর মূল্য লইয়া বিদায় হইল।

মহাপ্রস্থান শৃঙ্গ চিরহিমানী-সমাচ্ছন্ন। শৃঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫০০।৬০০ হাতের অধিক হইবে না। শৃঙ্গের নিম্ন ভাগে বিস্তৃত গুহামুখ। গুহার ভিতর ভিন্ন রাত্রিযাপনের স্থান নাই দেখিয়া বিশ্রামাদির পর আমরা সমস্ত দ্রব্য গুহার ভিতর লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। গুহামুখের পরিধি প্রায় তিন শত হাত। ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম—গুহার পরিধি নীচে ক্রমেই অল্প হইয়া গিয়াছে। গভীরতা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সাহেব বলিলেন, প্রায় ৬০০ হাত। তখন গুহার নিম্নভাগ অন্ধকারময় ছিল। অন্তস্তল অবধি দেখা গেল না বলিয়া সাহেবের গণনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না।

আমাদিগকে এই তুষারময়, জনমানবহীন স্থানে রাখিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতমালার অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার নিস্তেজ পীতালোক আমাদিগকে ত্যাগ করিল। আমরা গুহার মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া একটু অন্তরে শয়ন করিলাম। করুণাময়ী নিদ্রা এত দূরে, এই পর্ব্বতে আসিয়া আমার শ্রমক্লিষ্ট অঙ্গ সকল অমৃতসিঞ্চনে স্বস্থ করিলেন।

প্রাতঃকালে বোটলিং ও রাজার কথায় নিদ্রা ভাঙ্গিল। গুহার বাহিরে আসিবামাত্র প্রকৃতির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িল। সূর্য্যের সুবর্ণ কর হিমালয়ের শুভ্রকিরীটু মণ্ডিত মস্তকে বিরাজ করিতে ছিল। অত্যুচ্চ, অপূর্ব্ব হীরকস্তূপ সমূহের ন্যায় চারিদিকে উজ্জ্বল কিরণরাশি ছড়াইয়া হিমালয় রাজরাজেশ্বরের ন্যায় শোভিতে ছিল। আমার সমীপবর্ত্তী গিরিনির্ঝর স্পর্শমণিপৃষ্ঠের ন্যায় সূর্য্যকর অঙ্গে মাখিয়া বিচিত্র বর্ণের মণি মাণিক্য সকল আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার রাশির ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতলোমাবৃত ছাগলের দল পর্ব্বতের গহ্বর ত্যাগ করিয়া সম্মুখে প্রমোদ-নৃত্য করিতে লাগিল। আমি মোহিতচিত্তে দেখিতেছি—দেবীপ্রসাদ আমাকে ডাকিলেন।

ভিতরে আসিয়া দেখি বোটলিং গুহার মুখে এক বৃহৎ হুক পুতিয়া তাহার উপর দিয়া শণ ও রেসম নির্ম্মিত রজ্জু ঝুলাইয়াছেন, এবং আপনি একটা বোঝা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমার প্রভু আর এক বোঝা লইয়া সাহেবের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তৃতীয় বোঝা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট।

আমাদের নিকট প্রায় তিন মাসের আহারীয় ও তিন চারি দিন চলিতে পারে এরূপ জল ছিল। আর অধিক জল লইয়া যাওয়া নিতান্ত কঠিন, সাহেবের মতে তাহার আবশ্যকও নাই। তিনি বলিলেন পর্ব্বতের ভিতর যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে।

বেলা প্রায় একটার সময় আমি গুহার তলে অবতীর্ণ হইলাম। তখন বোটলিং যন্ত্রাদি বাহির করিয়া তাঁহার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল খাতায় লিখিতে ছিলেন; রাজা প্রসন্নমুখে এক পাঁঠরির উপর উপবিষ্ট। শ্রান্তিতে আমি অবশপ্রায় হইয়াছিলাম; নামিয়াই ঊর্দ্ধমুখে শুষ্কপ্রস্তরশয্যায় শয়ান হইলাম। উপরে মহাপ্রস্থানের মুখ দৃষ্ট হইল। তাহার উপর উজ্জ্বল নীল আকাশের স্বল্পায়তন চক্রমণ্ডল। দুই একটি শ্যেন পক্ষী সুনীল সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আকাশে ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টি পথে আসিল, আবার দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

এই সময়ে দেবীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গুহার তলে দুইটি বড় বড় ছিদ্র ছিল; রাজা উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী ছিদ্রের নিকট দাঁড়াইয়া পাষাণভিত্তির দিকে চাহিয়া আছেনএবং উল্লাসে নানা প্রকার শব্দ করিতেছেন। সহসা এরূপ ভাবান্তরের কারণ বুঝিলাম না। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে আসিয়া দেখি ছিদ্রের মুখের নিকট পাষাণ ভিত্তিতে স্পষ্ট নাগরাক্ষরে লেখা আছে।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং পিহিতং গুহায়াম্‌।"

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনের উল্লাসে পরিশ্রম, ক্লান্তি, ক্ষুধা—সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। তখনই গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করিলাম; রাজা বলিলেন, স্বর্গের দ্বারে আসিয়া বিলম্ব করা অনাবশ্যক। চল, আমি প্রস্তুত আছি।

গহ্বরের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম। অন্য সময়ে গহ্বর দেখিয়া লোম হর্ষণ হইত। বস্তুতঃ পৃথিবীতে বোধ হয় এরূপ লোক অতি অল্প আছেন, যাঁহারা স্থিরচিত্তে, স্থিরপদে সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। যতই সাহসী হউন, তাঁহার হৃৎকম্প হইবে। কূপের ন্যায় সমান ভাবে গভীর সেই গিরিগহ্বর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রস্তর খণ্ড সকল আমাদের দাঁড়াইবার স্থল স্বরূপ হইয়া কূপের পার্শ্বে বাহির হইয়াছে। গাঢ় অন্ধকার ও অল্প আলোক একত্র মিশিয়া তাহার ভিতর আধিপত্য করিতেছে। আমি সাহেবের দৃষ্টান্তে এক বৃহৎ রজ্জু গহ্বরের মুখস্থিত এক উন্নতমস্তক প্রস্তরের উপর দিয়া নীচে ঝুলাইয়া দিলাম। দেবীপ্রসাদ অগ্রে নামিলেন; সাহেব তখন চঞ্চল মনে, অস্থির পদে, অস্পষ্ট স্বরে নানা ভাষায় কি বলিতে বলিতে বেড়াইতেছিলেন। আমি ডাকিলাম, তিনি শুনিলেন না। আবার উচ্চস্বরে ডাকিলাম; চাহিলেন; বলিলাম আসুন, নীচে যাওয়া যাউক। সাহেব অন্যমনে আমার নিকট আসিলেন।

দেবীপ্রসাদ তখন প্রায় ত্রিশ হস্ত নীচে এক প্রস্তর খণ্ডের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা একে একে সকলে একত্র হইলাম। রাজা এক প্রান্ত টানিয়া উপর হইতে দড়ী খুলিয়া লইলেন। পুনর্ব্বার উপরে উঠিবার চিন্তা তখন কাহারও মনে আসিল না।

তিন বার এইরূপে নামিয়া আমরা একবারে আলোকের অধিকার অতিক্রম করিলাম। সাহেব তাঁহার তাড়িতালোক প্রস্তুত করিয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইলেন। সমস্ত গহ্বর সেই শীতল, উজ্জ্বল আলোকে অপূর্ব্ব ঝকিতে লাগিল—উজ্জ্বল প্রস্তরে প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বল আলোক আরও উজ্জ্বল হইল। একটু বিশ্রামের সময় আমরা আবার নামিতে লাগিলাম। রাত্রি দশটার পর আমরা কূপের পার্শ্বে নিশাযাপনের উপযোগী স্থান পাইলাম; আহারাদির পর প্রগাঢ় নিদ্রায় রাত্রি অতিপাতিত হইল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার আমরা পূর্ব্ববৎ কূপের নীচে নামিতে লাগিলাম; পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার কূপের পার্শ্ববর্ত্তী গহ্বরে রাত্রিযাপন করিতে হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিবস ক্রমাগত এইরূপে নামিয়া আমরা অবশেষে গুহাতলে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানের পরিসর অধিক নয়; ছয় সাত ব্যক্তি শয়ন করিলে আর স্থান থাকে না। সাহেব নীচে আসিয়াই বলিলেন, আমরা গ্রানাইট প্রস্তরের সীমা অতিক্রম করিয়া অঙ্গারের স্তরে আসিয়াছি।

এই স্থানে আমাদের ভয়ানক জলকষ্ট অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে যে জল ছিল, গত পাঁচ দিনে তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়াছিল। সাহেব বলিয়াছিলেন, কূপের নীচে নামিয়াই জল পাওয়া যাইবে; সে আশাও এখন বিফল হইল; কূপের নীচে কোন স্থানে জল পাইবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। নিরাশা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা আরও বাড়িল। আমি কিছুমাত্র আহার করিতে পারিলাম না, সাহেব তাঁহার অভ্যাসানুসারে অত্যুগ্র লোহিত পানীয়ে একরূপ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। এক একটী মাত্র বেদানা আমার ও রাজার শুষ্ককণ্ঠ ও জিহ্বা কথঞ্চিৎ সিক্ত করিল।

রাজা ও সাহেব উভয়েই শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, আমার নিদ্রা আসিল না। শয়ন করিয়া কর্ত্তব্যচিন্তায় ব্যাপৃত হইলাম। আমরা ক্রমাগত

উপরের রজ্জু খুলিয়া নামিয়া আসিয়াছি। এখন উপরে যাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের অধিষ্ঠানভূত গহ্বর দক্ষিণ প্রান্তে ক্রমে ঢালু হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। আমরা চিরজীবনের জন্য ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছি!—আর কতদিনই বা জীবিত থাকিব?—জলাভাবে দুই তিন দিনের মধ্যেই এ দেহের পতন হইবে—আবার ভাবিলাম, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? মৃত্যুই কেবল আমার হৃদয়বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে অল্প তন্দ্রাভিভূত হইলাম। তন্দ্রাভঙ্গে দেখি সাহেব ও রাজা প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন। তৃষ্ণা ও অনিদ্রাবশতঃ আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া ছিলাম; তথাপি শূন্যহৃদয়ে, মৃদুপদে আমার বোঝা লইয়া তাঁহাদের অনুগামী হইলাম। আমাদের পথ নদীতীরের ন্যায় ঢালু হইয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়া গিয়াছে। পথের পরিসর পাঁচ হস্তের অধিক নয়। নীচে, উপরে, উভয়পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দৃঢ়বদ্ধ পাষাণরাশি। সাহেবের উজ্জ্বল তাড়িতালোক এখানে নিতান্ত নিষ্প্রভ, নিতান্ত অনুজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইলেও, আজি শরীর ক্রমে অধিকতর অবশ ও মন অধীর হইয়া উঠিল। প্রায় আট ঘণ্টার পর আমরা এই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত গহ্বরে উপস্থিত হইলাম। সাহেব বলিলেন, আমরা হীরকস্তরে আসিয়াছি।

সাহেবের স্কন্ধস্থিত তাড়িতালোক তখন গুহামধ্যে শত সূর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার কথায় চারিদিকে চাহিলাম; চক্ষু ফিরিল না। ক্ষণকালের জন্য সকল ক্লেশ, সমস্ত যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইল। সমস্ত গুহা উজ্জ্বল মধুর আলোকময়, অপূর্ব্ব শোভাময়। সাহেব বলিলেন, তুরস্কের রাজসভা ইহার নিকট কি তুচ্ছ পদার্থ, আমরা আজি পৃথিবীর সকল রাজা অপেক্ষা অধিক ধন সমৃদ্ধিতে পরিবৃত। হীরকময় গৃহে, হীরকের আসনে, আজ আমাদের শয্যা। আজি যদি পৃথিবীর অর্থদাসদিগকে এই স্থান দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের ধনসংসর্গজনিত গর্ব্বের হ্রাস হইয়া পৃথিবীর উপকার হইতে পারিত।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন " হরিচরণ আমরা স্বর্গের সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এস্থান স্বর্গের বহির্দ্দেশমাত্র। ইহার পর যখন স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিবে, তখন বলিবে এত ক্লেশ, এত পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হইল—তখন বুঝিবে তুমি কিরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষ। দুঃখের বিষয় এই, মহিষী ও বৎসা তারা আমাদের ন্যায় সশরীরে স্বর্গলাভ করিতে পারিলেন না; পারিলে আমরা কত সুখী হইতাম, বলিতে পারি না। স্বর্গে তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে বটে, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ন্যায় সুখভোগ করিতে পারিবেন না।

সাহেব তখন যন্ত্রাদি খুলিয়া আপনার খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলাম, লিখিয়াছেন—

সোমবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৭৩।

ক্রনোমেটর--রাত্রি আটটা, ২০ মিনিট।

ব্যারোমেটর—৩০ ডিগ্রী।

থারমামেটর—৪৫ ডিগ্রী।

গন্তব্য পথের দিক—দক্ষিণ পূর্ব্ব।

পথের ঢালুতা—প্রতি মাইলে ৬০ ফুট।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা সর্ব্বশুদ্ধ কত নীচে আসিয়াছি?

সাহেব। ত্রিশ হাজার ফুট। আমরা সমুদ্রজলসীমায় উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের জলকষ্টের অবসান হইয়াছে। কল্য নিশ্চয়ই জল পাওয়া যাইবে। কিন্তু এখন অবধি আমাদিগকে অধিকতর বায়ুর ভার বহিতে হইবে। আমাদের বোঝার ভারও ক্রমে বাড়িবে। আর ব্যারোমেটরে চলিবে না। তৎপরিবর্ত্তে ম্যানোমেটর উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি প্রকাশ করিবে।

আমি। যত নীচে যাওয়া যাইবে, বায়ুর ভার ততই অধিক বোধ হইবে। সুতরাং অধিক নীচে গেলে আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে।

সাহেব। মন্দগতিতে নীচে নামিতে গেলে ক্রমেই আমরা অধিক ভারবহনে অভ্যস্ত হইব। নীচের গাঢ় বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদিতেও আমাদের ক্লেশ বোধ হইবে না। বেলুনারোহিগণ যদি উপরের অতি তরল, অতি লঘু বায়ুতে প্রাণ ধারণ করিতে পারে, কেনই বা নীচের রুদ্ধ গাঢ় বায়ুতে

আমাদের জীবন রক্ষা না হইবে?

দেবীপ্রসাদ আহারাদির উদ্যোগ করিলেন; আমি বলিলাম—আপনি আহার করুন—আমি কিছু খাইব না।

রাজা। কেন?

আমি। জলাভাবে আমার শরীর সম্পূর্ণ রসশূন্য হইয়াছে, এখন শুষ্ক চিড়া ও মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ হওয়া অসম্ভব।

রাজা। বেদানা আছে।

আমি। যাহা সম্বল আছে, তাহাতে আজি চলিতে পারে। কল্য কি হইবে?

রাজা। সে উপায় দেবতারা করিবেন। আমরা ক্ষণমাত্রও তাঁহাদের দৃষ্টির বাহিরে নহি। অনর্থক ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজন নাই।

রাজার অনুরোধে কিঞ্চিৎ আহার করিলাম; এক পোয়া বেদানার রস আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিল না।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকালে সকলে আবার নিয়মিত যাত্রায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন—"যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান যাত্রায় অধিক কষ্ট হয় নাই। এখন বোধ হইতেছে, সাহেবকে সঙ্গে আনিয়াই আমাদের এই ভীষণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে—দেবতারা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। পবিত্র ভূমি ত্রিদশালয়ে যবনের স্থান নাই।"

আমি উত্তর করিলাম না। তখন সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিতেছিল। পদগ্রন্থি সকল অবশপ্রায়—চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি নির্গত হইতেছে। কত বার পদ স্খলিত হইল; কত বার দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রুজল মিশাইলাম—আবার সঙ্গিগণের অনুবর্ত্তনে চলিলাম। সে যন্ত্রণা ও মনের নিরাশা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কতবার বহু জলাশয়া জননী বঙ্গভূমি, শীতল বাহিনী গঙ্গার বক্ষঃস্থল বিলাসিনী

কাশী মনে পড়িল, তৃষ্ণা শারীরিক যন্ত্রণা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল।—অবশেষে বেলা তুইটার সময় চৈতন্যশূন্যদেহে, ঘূর্ণিতমস্তকে ভূতলশায়ী হইলাম।

সাহেবের তীব্র লোহিত জলের সহায়তায় মোহভঙ্গ হইল। সুরাসেবনে শরীর আরও উষ্ণ হইয়াছে। মস্তক, শরীর, পর্ব্বত, সমস্ত ঘুরিতেছে। যেন জলন্ত অনলের মধ্যে দগ্ধ হইতেছি। নিতান্ত কাতর ভাবে বলিলাম, প্রাণ যায়।—আর কথা আসিল না; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

দেবীপ্রসাদ আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর নিতান্ত অস্ফুটভাবে কর্ণে প্রবেশ করিল—কিছুই বুঝিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম—আমার দয়ালু প্রভু বেদানা ভাঙ্গিয়া আমার মুখে দিতেছেন। দেখিয়াই দেহে নূতন বল, নূতন আশার সঞ্চার হইল। রাজা বলিলেন—হরিচরণ, কল্য আহারের সময় তোমার প্রদত্ত বেদানার মধ্যে একটি লুকাইয়া রাখিয়া ছিলাম। মনে করিয়া ছিলাম—যখন নিতান্ত কাতর হইবে, তখন তোমাকে দিয়া সুস্থির করিব। পথে আসিতে আসিতে কতবার মনে হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করি; প্রতিবারেই নিবৃত্ত হইয়াছি; পিপাসায় হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও ভাবী বিপদের জন্য রাখিয়াছিলাম—তাই এখন তোমার জীবন রক্ষা হইল। খাও;—বলিয়া দেবীপ্রসাদ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাজার দয়া ও স্নেহ দেখিয়া আমার চক্ষুতে জল আসিল। তৃষ্ণা দূর হইল, সবলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সুরার মাদকতা তখনও আমাকে ছাড়ে নাই। স্খলিতপদে সহচরদিগের অনুবর্ত্তী হইলাম। সমস্ত দিন চলিয়াও জল পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাত্রি আটটার সময় সকলেই কাতর হইয়া অগ্রেসরণে নিবৃত্ত হইলাম।

সমস্ত রাত্রি ভীষণ যাতনা। প্রাণ বাহির হইয়াও হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়িনী তন্দ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তাহার শেষ আক্রমণের সময় কল্পনা আমাকে গৃহচিত্র দেখাইল। বাগানে সরোবরের সোপানে পিতা, মাতা, দাদা, বধূ সকলে বসিয়া আছেন। যোগমায়াও সেখানে উপস্থিত। নানা প্রকার শীতলরস সুস্বাদ ফল মূল ও সুমিষ্ট পানীয় তাঁহাদের সম্মুখে সজ্জিত। আমি তৃষ্ণাকুল হইয়া সরোবরের জলে ঝাঁপ দিলাম। জল

শীতল নয়। দৌড়িয়া সোপানের উপর আসিয়া সমস্ত পানীয় পান করিতে লাগিলাম। তাহাতে দেহ শীতল না হইয়া বিষের ন্যায় মুখ, জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষঃ দগ্ধ করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিল; সহসা কতকগুলি রক্তকায় ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ ক্রোধভরে আসিয়া আমাকে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। আমি উচ্চৈঃস্বরে পিতাকে ডাকিলাম, —তিনি তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। দাদাকে, বধূকে—তাঁহারা রোষ-কষায়িত চক্ষে চাহিয়া, একটু বিকট হাসিয়া অন্তর্ধান হইলেন। শেষে যোগমায়া; যোগমায়া, রক্ষা কর, একবিন্দু জল দাও, প্রাণ যায়! —যোগমায়া নড়িল না, উঠিল না। তখন লজ্জার মাথা খাইয়া অকৃতজ্ঞ সন্তান মাতার দিকে চাহিল। স্নেহময়ী জননীর মন ব্যথিত হইল। তিনি বামস্তনের ক্ষীরধারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নি নির্ব্বাণ, শরীর শীতল হইল; কিন্তু পিপাসা কমিল না। কাতর মনে জননীর চরণ ধারণে অগ্রসর হইলাম, —অমনি তন্দ্রা পলাইল। সাহেবের ঘড়ি তাড়িতালোকে দেখাইয়া দিল, বেলা আটটা বাজিয়াছে।

আবার প্রস্থানোদ্‌যোগ। মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এরূপে শুষ্ক হওয়া অপেক্ষা ক্লেশকর কিছুই নাই। আজি আবার এই আসন্ন মৃত্যুমুখে আমার জীবনাশা অতি প্রবল। আশা ধীরে ধীরে আসিয়া অমৃতবর্ষী মধুর-স্বরে আমাকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিল। স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে মৃদুপদে সঙ্গীদিগের অনুগামী হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ আসিয়া আর পা চলে না। শেষে বেলা তৃতীয় প্রহরের পর নিতান্ত অচল ও অবশ হইয়া ভূতল গ্রহণ করিলাম। রাজাও আমার ন্যায় কাতর। তিনি আমার পার্শ্বশায়ী হইলেন। পৃথিবীর গর্ভে প্রস্তরাসনে আজি আমাদের মৃত্যুশয্যা।

সাহেব বলিলেন, আমরা হীরকের স্তর অতিক্রম করিয়াছি। নিশ্চয়ই এখানে জল পাইব; তোমরা এখানে থাক, আমি অগ্রসর হইয়া দেখি।

সাহেব চলিয়া গেলেন, রাজা নিরাশ হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

আমি প্রস্তরভিত্তিতে মাথা রাখিয়া মুদ্রিতনেত্রে স্থিরভাবে মৃত্যুর করে দেহ সমর্পণ করিলাম।

চিন্তাবেগ একবার একটু হ্রাস হইয়া আসিল। আমি প্রস্তরের ভিতর নির্ঝরের শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে শুনিয়া জলের শব্দ বলিয়া স্থির প্রতীতি জন্মিল। অমনি হৃদয়ের চিরনির্ব্বাণপ্রায় আশাদীপ জ্বলিল। উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম—জলের শব্দ।

রাজা। কোথায়?

আমি। প্রস্তর ভিত্তিতে কর্ণ রাখিয়া দেখুন।

রাজা আমার উপদেশ মত শুনিয়া বলিলেন,—নিশ্চয়ই নির্ঝরের শব্দ, চল, অগ্রসর হওয়া যাউক।

তখন দেহে নূতন জীবন আসিল। নূতন বল সংগ্রহ করিয়া উঠিলাম। দেখি সাহেব আসিতেছেন। তাঁহার চক্ষু প্রফুল্ল, মুখ প্রসন্ন; বুঝিলাম জল দেখিয়া আসিয়াছেন। সাহেব নিকটে আসিয়া বলিলেন, অল্প দূরেই জল আছে, আমি নির্ঝরের শব্দ স্পষ্ট শুনিয়া আসিয়াছি।

আমি বলিলাম, আমরাও এই প্রস্তরভিত্তিতে কর্ণ রাখিয়া জলের শব্দ শুনিয়াছি।

সাহেব। এই প্রস্তরের শব্দপরিচালকতা গুণ অধিক। তাহাতেই দূরের শব্দ বহন করিতেছে। চল, অগ্রসর হওয়া যাউক।

ক্রমে জলের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। আমরা আশার কথা শুনিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল চলিয়া আসিলাম।

এক স্থানে জলকল্লোলের শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট, অতিশয় উচ্চ। আর একটু অগ্রসর হইলাম, শব্দ কমিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। নিকটে দুই হস্ত অন্তরে নিঝর আছে স্পষ্ট প্রতীত হইল; কিন্তু শুষ্ক প্রস্তরময় পথ ও প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সাহেব বলিলেন, এই পাষাণভিত্তির অপর পার্শ্বে নিঝর আছে!

আমি সাহেবের দীপাধার লইয়া উর্দ্ধে, নীচে, চারিদিকে, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলাম। কোন স্থানে একটি ছিদ্রমাত্র নাই। এত ক্ষণে আশা-

দীপ নির্ব্বাণ হইল। বুঝিলাম, জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইবারও অধিক বিলম্ব নাই।

দেবীপ্রসাদ আমার নিকট শয়ান হইয়া দেবরাজের নাম ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাহেব কোন কথা না বলিয়া এক সূক্ষমুখ লৌহদণ্ড হস্তে, প্রস্তরে কাণ রাখিতে রাখিতে কষ্টে কিয়দ্দূর বাহিয়া উঠিলেন এবং যে স্থানে শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট, সেই স্থান বিদীর্ণ করিবার মানসে আঘাত আরম্ভ করিলেন। সাহেবের অদ্ভুত অধ্যবসায়! আমরা যখন একবারে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভূতল আশ্রয় করিয়াছিলাম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমে ক্লান্ত বোটলিং তখন জললাভাশয়ে অস্ত্রে গিরিভেদনে প্রবৃত্ত। আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর অন্যূন ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ ছিদ্র দিয়া সহসা প্রবলবেগে জলধারা বাহির হইল; সাহেবকে সিক্ত করিয়া, পথের অপর ভিত্তিতে আহত হইয়া শীতল জলধারা বহিল।

দেবীপ্রসাদ হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিয়া উঠিলেন,—সত্যযুগে ভগীরথ তপস্যাবলে স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করেন; আজি আপনি হিমালয় ভেদ করিয়া জলধারাদানে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন।

সুশীতল জলে স্নান করিয়া শরীর সুস্থ ও সবল হইল। আমরা চিড়া ভিজাইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলাম, আহার করিতে করিতে দেবীপ্রসাদ বলিলেন—হরিচরণ, ধর্ম্ম কুক্কুরবেশে যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা লইয়াছিলেন, এখন যবনমূর্ত্তিতে আমার পরীক্ষা লইতেছেন। আমি বেশ বুঝিয়াছি, সাহেব সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। পাণ্ডবের ন্যায় আমিও এত দিন উঁহাকে চিনিতে পারি নাই। যবন বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি; তাহাতেই এই অসহ্য যাতনা সহিতে হইল। এখন অবধি আর আমাদের কোন প্রকার কষ্ট হইবে না।

সাহেব কিয়দ্দূরে বসিয়া একমনে খাতায় লিখিতেছিলেন; রাজার কথা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইল না।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জলস্রোত সমানভাবে বহিতে লাগিল। আমি বলিলাম, জলের মুখ বন্ধ না করিলে আর আমাদের কখন জল কষ্ট হইবে না; ক্রমাগতই আমাদের গন্তব্য পথে প্রবাহ বহিবে।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন—আজি এক নূতন নদীর সৃষ্টি হইল। ইহার নামকরণ আবশ্যক। আমার প্রস্তাবানুসারে ইহার নাম হরিচরণ নদী হউক।

আমি হাসিয়া বলিলাম "সৃষ্টিকর্ত্তার নাম অনুসারে বরং ইহার নাম বোর্টলিং নদী হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় লোকেরা এখন বিদেশীয় জাঁকাল নামের অধিক গৌরব করে। তাহারা এ নাম সাদরে গ্রহণ করিবে। আরও ইহাতে ইউরোপে নদীর গৌরব সত্বর প্রচারিত হইবে।

সাহেব। না—আমার এই ভূগর্ভে বিজ্ঞানভ্রমণের প্রথম সম্মান তোমারই। তুমি অদ্যাবধি অমর হইলে।

দেবীপ্রসাদ আমাদের যাবনিক কথা বুঝেন না, বুঝিতে প্রয়াসও নাহি। সাহেব যখন উদারভাবে আপনার প্রবল পরার্থবৃত্তির পরিচয় দিতে ছিলেন, তখন আমার প্রভু প্রফুল্ল মুখে বসিয়া মুদ্রিতনয়নে গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমি অনর্থক সাহেবের সহিত বিবাদ না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অলৌকিক সম্মান গ্রহণ করিলাম।

সেদিন আমরা সকলেই সেই স্থানে বিশ্রামার্থ অতিপাতিত করিতে সংকল্প করিলাম। স্বর্গসুখচিন্তা ও মহাভারতে সন্ন্যাসীর, অতুল কীর্ত্তিলাভাশা ও যন্ত্রাদিতে সাহেবের এবং গৃহচিন্তা, গৃহদেবীচিন্তা ও তদানুষঙ্গিক দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজলে আমার, দিবস অতিপাতিত হইল।

প্রভাতে সকলেই সবলশরীরে, সোৎসাহমনে যাত্রা করিলাম। ক্ষুদ্র নদী হরিচরণ আমাদের চরণ প্রক্ষালন করিয়া কলনিনাদে পথ দেখাইয়া চলিল। অল্প-সলিল-বাহিনী তরঙ্গমালার উপর দিয়া চলিতে মন আনন্দে পূর্ণ হইল; বহুদূর চলিয়াও পথের ক্লেশ জানিতে পারিলাম না।

এইরূপে পনর দিবস অতীত হইল। জর্ম্মাণের গণনানুসারে আমরা নদীমুখ হইতে ১২০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে আসিয়াছি। গণনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা হিমালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নেপালের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। শত শত নগনদী ও ক্ষুদ্র পর্ব্বত, বহুজনপূর্ণ নগর ও গ্রাম সকল আমাদের মস্তকের উপর রহিয়াছে। মধ্যে কঠিন পাষাণময় ভূমি আমাদিগকে পৃথিবী হইতে পৃথক্ করিতেছে!

ষোড়শ দিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, দক্ষিণ দিকে অল্প আলোক প্রকাশ পাইতেছে। অতিপ্রত্যূষে গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট শুক্রতারার আলোকের ন্যায় অন্ধকারমিশ্রিত ক্ষীণালোক আমাদের পথের প্রান্তে দেখা যাইতেছে। মনে করিলাম, পর্ব্বতের কোন ছিদ্রপথে পৃথিবীর আলোক আসিতেছে। অনেক দিনের পর, তিন সপ্তাহেরও অধিক কাল এই অন্ধকূপে বাসের পর সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাইব বলিয়া মন পুলকিত হইয়া উঠিল। বন্দীর ন্যায় এই অতি অল্পপরিসর, গাঢ়তিমিরাবৃত স্থানে বাস করিয়া মনের বিরক্তি ও অবনতি জন্মিয়াছিল। আজি হয়ত অনন্ত বিস্তৃত নীলনভোমণ্ডলের একদেশ দৃষ্টিপথে পড়িবে। মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি—দূরাগত জলকল্লোল ও বায়ুতরঙ্গের ক্ষীণশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দ নিতান্ত অস্পষ্ট, আলোকও নিতান্ত ক্ষীণ। দুই তিনবার চক্ষু মার্জ্জন ও আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরীক্ষা করিলাম; স্বপ্ন নয়, জাগিয়া আছি; যথার্থই আলোক, যথার্থই বায়ু ও জলকল্লোলের বহুদূরাগত শব্দ!!

দেবীপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহাকে বলিলাম। তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "নিশ্চয়ই আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; সেই স্থানের দিব্য আলোক ও মন্দাকিনীর জলকল্লোলশব্দ শুনা যাইতেছে।

রাজার সোৎসাহ উচ্চবাক্যে সাহেবেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বলিলেন—সমুদ্রের জলকল্লোল। আমরা এরূপ শব্দে চিরাভ্যস্ত। বায়ুবেগে সমুদ্রের তরঙ্গমালা বেলাভূমি আঘাত করিলে দূরে এইরূপ শুনায়।

রাজা সাহেবের কথা না বুঝিয়া বলিলেন, স্বর্গে চিরবিরাজমান বসন্তের সহচর মলয়বায়ু সুরনদীর সাহচর্য্য করিতেছে।

সাহেব রাজার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, সমুদ্রের জলকল্লোল তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বোধ হয় ভারতমহাসাগরের কোন ভূগর্ভ-প্রবাহিত শাখা এস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

আমরা প্রস্থানের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলাম। ব্যস্ততায় রাজার নিয়মিত প্রভাতকৃত্য সম্পাদিত হইল না। সাহেব তাঁহার তাড়িতালোক প্রস্তুত করিলেন; আমরা দৈনিক যাত্রায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমেই দূরাগত ক্ষীণশব্দ প্রবল সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল। আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম—ব্যাপার কি? প্রায় একঘণ্টা পরে শব্দ কমিতে লাগিল। আর একঘণ্টা—আমরা গুহার বাহিরে উপস্থিত!

দেখি, এক প্রকার অনতি-উজ্জল আলোক বিস্তীর্ণ আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে উত্তাল বীচিমালাসঙ্কুল বিস্তীর্ণ অকুল সমুদ্র। পশ্চাতে ও বামভাগে পর্ব্বতমালা উন্নতমস্তকে জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। বায়ু প্রবল বেগে বহমান; তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া আমাদের পাদমূলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

সাহেব বলিলেন—সমুদ্র,—ভূগর্ভস্থিত বিস্তীর্ণ সমুদ্র। সমস্ত লোকের অপরিজ্ঞাত, বুদ্ধির ও কল্পনার অতীত এই জলরাশির আমিই প্রথম আবিষ্কর্ত্তা হইলাম। এতদিনে সকল শ্রম, সকল যত্ন সার্থক হইল। এখন ইহার নামকরণ আবশ্যক। আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রাজা বলিলেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে, উত্তপ্তজলা বৈতরিণী যমদ্বারে স্বর্গের পরিখারূপে বিস্তৃত আছে। স্বর্গে যাইতে হইলে সেই নদী অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। এই সেই বৈতরিণী। পাপিগণের পক্ষেই বৈতরিণী উষ্ণজলা। আমাদের শরীর নিষ্পাপ বলিয়া শীতলজলে আমাদের সম্মুখে বহিতেছে।

সাহেব বলিলেন এই সমুদ্রের এক ম্যাপ প্রস্তুত করিতে হইবে; এখন নামকরণ করিয়া সমস্ত লিখিয়া রাখা যাউক। আমি বলিলাম আমার প্রস্তাবে সমুদ্রের নাম বোটলিং সাগর হউক। সাহেব সম্মত হইয়া লিখিতে বসিলেন। ম্যানোমেটর ও থার্ম্মামেটরের গণনা লিখিয়া শেষে লিখিলেন,

—বোটলিং সাগর বা বৃহৎ হ্রদ। উত্তর পশ্চিমদিকে হরিচরণ নদী ইহাতে পড়িতেছে। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ৪০টি অন্তরীপ, ২০টি উপদ্বীপ ও ২৫টি উপসাগর আছে। ইহাদের নামকরণের ভার ভবিষ্যৎ-পর্য্যটকদিগের উপর রহিল। আমেরিগো বেচপুচির ন্যায় তাঁহারা স্ব স্ব নাম অনুসারে ইহাদের নাম রাখিতে পারিবেন।—

আমার একটু হাসি আসিল; সমুদ্রের প্রান্তে আসিয়া রাজার নিকট দাঁড়াইলাম। সমুদ্র এক এক বার দূরে পলায়ন করিতেছে, তলস্থিত সুবর্ণময় জলসিক্ত বালুকা ছাড়িয়া দূরে যাইতেছে;—নির্ম্মলজলে তুষারশুভ্রফেণ পুঞ্জ ভাসাইয়া আমাদিগকে উপহার দিতেছে, জলের উপর রাশি রাশি শুভ্রবর্ণ বাষ্প উঠিতেছে, আকাশে অনিবিড় মেঘের ন্যায় সঞ্চিত হইতেছে; অথচ তাহাতে আলোকের হ্রাস হইতেছে না। চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, নক্ষত্র নাই, এ আলোক কোথা হইতে আসিল?—সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন,—"তাড়িতালোক" এস্থানের জল, বায়ু, আলোক, সমস্তই তড়িৎ-প্রবাহ-সম্ভূত।

আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিকে অল্পদূরে, দুই পর্ব্বত শৃঙ্গের মধ্যে অল্পপরিসর একটু সমভূমি আছে। আমরা বিশ্রামার্থ সেই খানে গিয়া দেখি, পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে বিস্তীর্ণ মাঠ চক্রনগুলান্ত ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরে স্থানে স্থানে উচ্চ বৃক্ষাদিও দৃষ্ট হইল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। সাহেব বলিলেন "এখানে যে ভূমি অকৃষ্ট ও মনুষ্যভোগবিবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে অনায়াসে এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে। এই ভূমির বিস্তার কতদূর—কে বলিতে পারে? ভূমণ্ডলের উপরিভাগের ন্যায় এ স্থানও জলস্থলে বিভক্ত। সূর্য্যের পরিবর্ত্তে তড়িৎপ্রবাহ আলোক ও উত্তাপ দিতেছে—এখানে কি কোন প্রকার অধিবাসী নাই?—কল্য প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিয়া দেখিব,—আছে কি না।"

অনেকক্ষণের পর আমরা গুহামুখের ভিতর আসিলাম। আহারাদির পর পাঁচ ঘণ্টা কাল নিদ্রায় অতিপাতিত হইল।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া আমরা পূর্ব্বদিনের প্রস্তাবানুসারে নূতন দেশ পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। সাহেব তাঁহার যন্ত্রাদি ও বন্দুক সঙ্গে লইলেন। আমাকেও তাঁহার কতকগুলি যন্ত্র বহন করিতে হইল। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ চলিয়া আমরা পর্ব্বতমালার পশ্চিম দিকে ফিরিলাম। ফিরিয়াই সম্মুখে—প্রায় চতুষ্কোণ অত্যচ্চ গৃহশ্রেণী। সংগৃহীত পাষাণখণ্ডসমূহে গৃহভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইল। নিকটে আসিয়া প্রস্তরান্তরালে দেখি গৃহের মধ্যে প্রকাণ্ডকায় মনুষ্যাকৃতি পাঁচ ছয় জন বসিয়া প্রস্তরপাত্রে কি পাক করিতেছে। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। শরীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও প্রায় লোম-শূন্য। সকলেরই কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ, অঙ্গুলিতুল্য এক একটি লাঙ্গুল আছে। আমরা দেখিতেছি—একজন দাঁড়াইয়া সঙ্গীদিগকে কি বলিতে লাগিল। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাত হাত। মস্তক অতি ক্ষুদ্র ও তাহার উপরিভাগ কড়ার মত সম্পূর্ণ সমতল। হস্ত ও পদতল প্রায় আমাদের মত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিসর ও বিলক্ষণ বক্র। তলভাগ অপেক্ষা অঙ্গুলি গুলি অনেক বড়; তাহাতে সুদীর্ঘ বক্র নখররাজি বিরাজ করিতেছে। বক্তার দন্ত গুলি প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ, অল্পপরিসর ও প্রায়ই সূক্ষ্মাগ্র। চক্ষু প্রায় গোল, নাসিকা চীন-বাসীদের ন্যায় চাপা। মুখ গোল ও শ্মশ্রুবর্জ্জিত।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন দেবরাজ ও সাহেবরূপী ধর্ম্মের চক্রে আমরা নরকের সীমায় আসিয়াছি। যুধিষ্ঠিরকেও আমাদের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। বোধ হয় আমার পূর্ব্বাচরিত পাপের কিছু অবশিষ্ট ছিল। এখন তাহার ক্ষয় হইল। নিশ্চয়ই এখন দেবরাজের পুষ্পক রথ অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া শূন্যপথে আমাদিগকে বৈতরিণীর পর পারে লইয়া যাইবে। স্বয়ং ধর্ম্ম যখন আমাদের সহচর, তখন এ সকল চিন্তার প্রয়োজনও নাই।

সাহেব বলিলেন, ইহারা নিশ্চয়ই হয় গবিলা, না হয় এক প্রকার অসভ্য মনুষ্য। এস, আমরা ঐ স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া ইহাদের কার্য্য দেখি।

সাহেবের নিদর্শনমত আমরা গৃহশ্রেণীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীব বেষ্টিত এক অল্প অন্ধকারময় গৃহে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে প্রস্তরভিত্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-ছিদ্র গুলি গৃহবাসীদিগকে দেখাইতে লাগিল। সাহেব মৃদুস্বরে বলিলেন— পশুদের ন্যায় অসভ্য মনুষ্যদিগেরও ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। এখানে কথা কহিলে ভিতরে শুনা যাইবে। নীরবে দাঁড়াইয়া দেখ।

গৃহের দ্বারে প্রায় তিন হাত উচ্চ করিয়া বড় বড় পাষাণখণ্ড সাজান ছিল। সাজাইবার গুণে ভিতরের দিকে প্রস্তরের সোপান হইয়াছে। বক্তা কথা শেষ করিয়া তাহার উপর উঠিল এবং লম্ফ ত্যাগে নীচে নামিয়া চলিয়া গেল। আমরা প্রথমে যেথানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সে স্থান ত্যাগ না করিলে তাহার সম্মুখে পড়িতে হইত।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর বক্তা চারি পাঁচ জন লাঙ্গুলধারীর সহিত গুহায় পুনরাগমন করিল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক এক খানি অনতিস্থূল প্রস্তরময় অস্ত্র ছিল। আগন্তুকেরা আসিয়া বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের উপর স্ব স্ব অস্ত্র ঘসিতে বসিল।

গৃহবাসীদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই আছে। পুরুষদিগের শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক লোমাচ্ছন্ন। স্ত্রীগণের দেহে যে দুই এক গাছি লোম আছে, পুরুষেরা নিকটে বসিয়া তাহা ছিঁড়িয়া দিতেছে। সাহেবের মতে স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনই এরূপ আচরণের কারণ।

কিয়ৎক্ষণের পর পাকসমাপন হইল। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে সকলে আসিয়া পাকস্থালীর চারি দিক ঘেরিয়া বসিল। অল্পক্ষণ পরেই ভোজনারম্ভ। আহারের বস্তু অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস ও বোধ হয়, এক প্রকার উদ্ভিজ্জ, একত্র মিশ্রিত। তাড়া তাড়ি অধিক খাইবার আশয়ে সকলেই ব্যস্ত; অবশেষে দুই এক জন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পশ্চাতে লুকাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্ষণকাল পরেই পাকস্থালী একজনের স্কন্ধে উঠিল। সকলেই তাহা হইতে আহারীয় লইবার জন্য ধাবিত হইল। শেষে বিবাদ, নখাঘাত, দন্তাঘাত ও রক্তপাতে ভোজনাবসান হইল।

আহারান্তে গৃহবাসিগণ আবার শান্তমূর্ত্তি ধরিল ; আমরাও নিঃশব্দমৃদুপদে গুপ্তস্থান ত্যাগ করিলাম।

আহারান্তে সুখাসীন হইয়া সাহেব বলিলেন—দেখিতেছি ইহারা মানুষও নয়, গরিলাও নয় ; তাহাদের মধ্যসীমাস্থিত জীববিশেষ। ইতর প্রাণিগণের অবস্থা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। সিম্পাঞ্জি, ওরাঙ্গ প্রভৃতি বনমানুষের সহিত মনুষ্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম। সমান হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া, বাক্শক্তি, পাক করিয়া ভোজন, আত্মরক্ষার্থ প্রস্তরের তরবার, গৃহে একত্র বাস, লোমশূন্য শরীর প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মই আছে। কেবল লাঙ্গুল খসিতে অবশিষ্ট আছে। তাহা হইলেই ইহারা লাঙ্গুলহীন অসভ্য মনুষ্যমধ্যে গণ্য হইয়া মহাপ্রস্থানপথে ভূমির উপর উঠিবে। প্রাচীন হুন ও গথদিগের ন্যায় আবার সমস্ত ইউরোপ ব্যাপিবে।

দেবীপ্রসাদ আমাদের বাগ্‌যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কলবাহী হরিচরণ নদের তীরে শয়ন করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আমিও মৌনাবলম্বনে সাহেবকে জয়ী করিয়া বস্ত্রে সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে শয়ান হইলাম।

অসময়ে নিদ্রা আসিল না। ভাবিতে লাগিলাম। চিরকাল ডারউইনের মত উপহাস করিতাম। আজি তাঁহার মতের সমর্থক অনেক গুলি উদাহরণ প্রত্যক্ষ গোচর হইল। সাহেবের মত ভ্রমাত্মক নয়। তিন চারি শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতলবাসী এই জীবগণ বিশ্বমাতা প্রকৃতির সংস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করিয়া, পৃথিবীর উপর উঠিয়া, দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইবে। পঙ্গপালের ন্যায় পারস্য, আরব, তুরস্ক ছাইয়া ইউরোপে গিয়া পড়িবে ; গল, বাণ্ডেল ও হুনদিগের ন্যায় জর্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড পদদলিত করিবে—সেখানকার ধন ও বাহুবলে মত্ত লোকদিগকে শিখাইবে, পরাধীনতায় কত সুখ—কি জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত ভারত একস্বরে রোদন করিত ;—দেখাইবে, অধীন জাতিকে তুচ্ছকীট, বনের শৃগাল, পথের কুক্কুর বলিয়া সম্বোধন করিলে,

সেইরূপ ব্যবহার করিলে, মানুষের হৃদয় কিরূপ ব্যথা পায়। জগতের জননী মা প্রকৃতি! তুমি অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, ধার্ম্মিকের আশ্রয়, ক্ষুধিতের অন্ন, তৃষিতের জল, পীড়িতের ঔষধ; আর যাহারা স্বার্থের জন্য তোমার কোটি কোটি সন্তানকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্লেশ দেয়, তাহাদের সকল দর্পচূর্ণকরী! মা, সাহেবের মুখে ফুল চন্দন পড়িয়া আমার জাগ্রৎস্বপ্ন কি সফল হইবে।

জননী, ইউরোপীয় জাতির অত্যাচারের সীমা নাই। পৃথিবীর প্রারম্ভ অবধি তাহারা পরধনলোলুপ, পরশ্রীকাতর ও পরপীড়ক। মা, আমাদের কোন্ দোষে আলেকজাণ্ডার ভারতের পবিত্রহৃদয়ে যবনের অপবিত্র পদাঙ্ক স্থাপন করিল, আমাদের সর্ব্বস্ব ধন মানময় জীবন হরণ করিল? কোন্ অপরাধে রোমের সিজারগণ একে একে আসিয়া আসিয়ার পুণ্যভূমি পদদলিত করিল। কোন্ বিচারে পর্টুগিজ বণিকেরা ভারত লুণ্ঠন করিয়া স্বীয়োদর পূরণের ব্যবস্থা পত্র দিল। কেন বল, পরাক্রান্ত ফরাসী অবধি ক্ষুদ্র প্রাণী দিনেমার ও ওলন্দাজ পর্য্যন্ত দলে দলে এখানে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি আর্য্যসন্তান স্ব স্ব রণলক্ষ্মী ও ধনলক্ষ্মীর সম্মুখে বলিদান দিল। মা, যদি মহামূল্য ভারতরত্নে শেষে ইংরাজের সুবর্ণকিরীট শোভিত করিতে তোমার ইচ্ছা, তবে কেন সমস্ত ভারত কেবল ইতরজন্তুতে পূর্ণ করিলে না; তাহারা ইংরাজের আদর পাইত। দিবা রাত্রি মনুষ্যের রোদনধ্বনিতে তোমার কর্ণবিবর বিদীর্ণ হইত না!

সাহেব বলিলেন হরিচরণ, নিদ্রিত হইয়াছ?

আমি। না।

সাহেব। কি ভাবিতেছ?

আমি। ভাবিতেছি, এত দিনে বুঝি রাজরাজেশ্বরী প্রকৃতির আসন টলিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিদিগের অপরাধের দণ্ডজন্য হুন ও গলদিগের ন্যায় এই নূতন অসুরদলের সৃষ্টি হইতেছে। ইহারা যখন দলে দলে ইউরোপ ছাইবে, তখন তোমাদের কি দশা হইবে।

সাহেব। ও সকল কথা ছাড়িয়া দাও। আমরা প্রাণিবিজ্ঞানের কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলাম, কত ভ্রম ঘুচাইলাম, বলিতে পারি না। এই

মনুষ্যজাতির উৎপত্তি স্থান। প্রথমে এই স্থানের বাহির হইয়া আর্য্যজাতি ইরান্ দেশে বাস করেন। কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ মনুষ্যেরাও এই স্থানে উৎপত্তি লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে গিয়া বাস করিয়াছে।

আমি। ভারতবর্ষপীড়ক অসুরদলেরও বোধ হয় এই উৎপত্তিস্থান।

সাহেব। তাহাতে সন্দেহ কি?—এখন পৃথিবীর উপর উঠিয়া এই অভিনব তত্ত্ব সকল লোক সমাজে প্রকাশ করা যাউক।

তখন বেলা প্রায় ছয়টা। সাহেব শয়ন করিলেন। আমি সুখময় চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলাম; অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিল।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর গণনানুসারে যখন রাত্রি একটা, তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমরা রাত্রির আলোকে শয়ান আছি। চন্দ্র সূর্য্য এস্থানের সময়নিয়ামক নহেন। তাড়িতালোক সর্ব্বক্ষণ সমান উজ্জ্বল। কেবল ঘড়ির কাঁটা আমাদিগকে দিন রাত্রি দেখাইয়া দিতেছে।

অল্পক্ষণ পরে রাজা ও সাহেব উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন। সাহেবের প্রস্তাবে আমরা আবার নূতন দেশ দেখিতে চলিলাম। পূর্ব্বদিন যে দিকে গিয়াছিলাম, সে দিকে না গিয়া সমুদ্রের তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পর এক মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্ট হইল। মন্দিরের পশ্চিম প্রান্ত বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার ক্ষুদ্র দ্বার দেখা গেল। সাহেব বলিলেন—মন্দিরটি প্রকৃতিসম্ভূত নয়; ইহার দ্বার অস্ত্রভিন্ন প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মন্দিরের বহির্ভাগ ও দ্বারদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, দ্বারের উপরিভাগে লুপ্তপ্রায় নাগরাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

দেবীপ্রসাদ দেখিয়াই হর্ষে ও উৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; আমি সাহেবকে অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। দেবীপ্রসাদ দৌড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করি-

লেন। আমরা তাঁহার অনুগামী হইলাম। ভিতরে আসিয়াই রাজা সাহেবের পদতলে পতিত হইলেন। বলিলেন,—ভগবন্, চিরকাল সাহেবের উপর আমার অশ্রদ্ধা ছিল, তাই আপনি সেই মূর্ত্তিতে আমাকে শিক্ষা দিলেন; সেই পাপে আমাকে এত কষ্ট পাইতে হইল; সেই পাপে নরক দর্শন ঘটিল। আমি বৈতরণী পার হইবার উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল হইতে ছিলাম; সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আমাদের সঙ্গী, তিনি সে উপায় করিয়া রাখিয়াছেন—জানিয়াও আমার পাপ মন সন্তুষ্ট হয় নাই—ভগবন্, আমাকে ক্ষমা করুন—

রাজার কথায় চারিদিকে চাহিলাম,—দেখি আমাদের বামপার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত ভেলা রহিয়াছে। দেখিয়াই বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইয়া উঠিল—কিয়ৎক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—রাজার শেষ কথা শুনিতে পাইলাম না।

সাহেব বিরক্তির সহিত বলিলেন—"তুমি অত্যন্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী, মূর্খ লোক। তুমি এস্থানের উপযুক্ত নহ। উঠিয়া দেখ, এরূপে বিরক্ত করিও না।

সাহেব ভেলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, প্রাচীন কালের এক প্রকার কঠিনকাষ্ঠে এই ভেলা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে কোন মনুষ্য সমুদ্রযাত্রা-মানসে এই ভেলা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সুখের বিষয় এই, তাহার লিখিত কোন গ্রন্থ নাই—পৃথিবীর কোন লোক এই স্থানের অস্তিত্ব জানে না।

এই সময়ে দেবীপ্রসাদ ভেলার অপর পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠফলক দেখিয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—আমি সেই স্থানেগিয়া দেখি, কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

"উড়ুপোঽদৃষ্টদর্শিনাম্"

রাজা। অদৃষ্টদর্শীদিগের জন্য এই ভেলা অর্থাৎ ভেলায় আরোহণ করিয়া বৈতরণী যাত্রা করিলে ভাগ্যদর্শন হয়। বৈতরণী যমদ্বার দিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, যমালয়ে মানুষের সুখদুঃখনিয়ামক অদৃষ্টচক্র নিয়ত ঘুরিতেছে। ইহার আরও এক গুরুতর অর্থ আছে। যাঁহারা চিরসৌভাগ্য কামনায়

সশরীরে স্বর্গগমনে সংকল্প করেন, তাঁহাদের বৈতরিণী পার হইবার জন্য এই ভেলা।

সাহেব বাক্যার্থ শুনিয়া বলিলেন---অদ্‌রিষ্ট শব্দের ঠিক অর্থ কি ?

আমি। যাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ ভাগ্য।

সাহেব। যাহা দেখা যায় না।—তাহা হইলেই তাৎপর্য্য বুঝা গিয়াছে। এখানে যে সকল পদার্থ দেখা গেল, তাহাই একরূপ অদ্‌রিষ্ট ; সমুদ্র যাত্রা করিলে এরূপ পদার্থ অনেক দেখা যাইবে, যাহা কেহ কখন দেখে নাই, ভাবেও নাই। চল, ভেলায় সমুদ্রযাত্রা করা যাউক। আমি যে কত সম্মান পাইব, তাহা ভাবিতেও পারিতেছি না।

রাজা ও সাহেব আপনাদের বাসনানুসারে বাক্যের অর্থ লইয়া বকিয়া চলিলেন। সমুদ্রযাত্রা স্থির হইল। আমিও কোন আপত্তি করিলাম না ; ভাবিলাম, দেখা যাউক—বেদব্যাসের কত দূর দৌড় !

সাহেব ভেলার জীর্ণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, সূত্রধরদিগের ব্যবহার্য্য সমস্ত যন্ত্রই তাঁহার নিকট ছিল। তিন দিন পরে ভেলা সমুদ্রযাত্রার একরূপ উপযোগী হইল। সাহেব ভেলার মধ্যস্থলে কাষ্ঠের মাস্তুল লাগাইয়া পাইল দিবার জন্য মোটা দড়ি টাঙ্গাইয়া দিলেন। আমাদের সমস্ত দ্রব্যাদি তাঁহার উপদেশানুসারে ভেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্ষিত হইল। পঞ্চম দিবসে ভাঁটা ও অনুকূল বায়ু পাইয়া আমরা তীরত্যাগ পূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলাম। নৌকা পাইলভরে ও জলস্রোতে সমান দ্রুতগতিতে চলিল। সাহেব হাইল ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমরা কূলের নিকট দিয়া যাইতে ছিলাম। সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল, স্থানে স্থানে ভেকের ছাতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের বন, আবার কোন স্থান সম্পূর্ণ বৃক্ষহীন। এক স্থানে দেখিলাম—একপ্রকার বৃহৎ কুক্কুর ও বৃহৎ বিড়ালে যুদ্ধ হইতেছে। উভয় পার্শ্বে বানরের ন্যায় হস্তপদতলবিশিষ্ট, লোমাচ্ছন্নদেহ, লাঙ্গুলহীন মানুষাকার জন্তুগণ দাঁড়াইয়া ধূম পান করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছে। কুক্কুর ও বিড়ালের গলায় দড়ী ঝুলিতেছে। সাহেব বলিলেন, ইহারাও অল্প দিন পরে সম্পূর্ণরূপে

মনুষ্য হইয়া উঠিবে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত জন্তুদ্বয় পালিত সিংহ ও ব্যাঘ্র। এইরূপে চারি পাঁচ পুরুষ অতীত হইলে ইহারাও সম্পূর্ণরূপে কুকুর ও বিড়াল হইয়া উঠিবে।

দুই দিনের পর আমরা একেবারে কূল হারাইলাম। আমাদের গতি দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে। সাহেবের মতে আমরা প্রতিঘণ্টায় তিন ক্রোশ বেগে যাইতেছি। এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল।

সাহেবের গণনানুসারে আমরা আগরা বা কানপুরের নীচে আসিয়াছি। গঙ্গা যমুনা আমাদের মাথার উপর বহিতেছে; রেলওয়ে গভীর শব্দে নদ নদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বেগে দৌড়িতেছে। শত শত অত্যুচ্চ পাষাণময় অট্টালিকা পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় আমাদের মস্তকের উপর দণ্ডায়মান; কোটি কোটি মনুষ্য আনন্দে বিচরণ করিতেছে,—আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেছে; দেখিতেছে—মস্তকের উপর চন্দ্র সূর্য্য অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে; রাত্রিতে নবীন নীলাম্বরের উপর অসংখ্য ছোট বড় হীরার কুচি ছড়ান রহিয়াছে—নবীন নীরদমালা মধ্যে মধ্যে ছায়াদান ও জলদান করিতেছে—

সহসা সমুদ্রের জল তোলপাড় হইতে লাগিল। অত্যুচ্চ তরঙ্গসকল তরঙ্গাঘাতে দ্বিগুণ বল পাইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে—দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে বীচিমালা আমাদের ক্ষুদ্র যান বক্ষে লইয়া উপরে উঠিল, তখনই আছড়াইয়া নীচে ফেলিল,—আবার উপরে তুলিল—সেখান হইতে গড়াইয়া নৌকা নীচে পড়িল। দেবীপ্রসাদ নৌকার মাস্তুল জড়াইয়া ধরিলেন। সাহেব আমাকে না ধরিলে আমি ভেলাচ্যুত হইয়া সমুদ্রসাৎ হইতাম।

সহসা সমুদ্রের এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সাহেবকে কারণ জিজ্ঞাসিলাম। সাহেব অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইলেন; সর্ব্বনাশ!—দেখি, দুই বৃহৎ জলময় জন্তু সমুদ্রের উপর উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক হস্ত দীর্ঘ এক অর্দ্ধকচ্ছপ, অর্দ্ধকুম্ভীরাকৃতি জন্তুর সহিত এক বৃহৎকায় হাঙ্গরসদৃশ জলচরের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। কুম্ভীরের মুখের পরিধি প্রায় তিন শত হাত হইবে; হাঙ্গরের দেহের মধ্যভাগের পরিধি অন্যূন ছয়শত হাত। কুম্ভীর আপনার

বৃহৎ মুখ ব্যাদান করিয়া হাঙ্গরের মস্তকের উপরিভাগ অবধি চক্ষু পর্য্যন্ত কবলিত করিয়াছে। হাঙ্গরের বিশালদন্তবিশিষ্টমুখমধ্যে কুম্ভীরের স্কন্ধের একাংশ প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকা যায় যায় হইয়া উঠিল।

মধ্যে মধ্যে জলস্তম্ভ সকল পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে; সমরপ্রবৃত্ত জন্তুগণ একবার আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আবার দূরে যাইতেছে। প্রবল তরঙ্গে ভেলা কতবার জলমগ্ন হইল। তাহার সহিত আমরাও জলমগ্ন হইলাম। একমাত্র মাস্তল অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে ভেলার পৃষ্ঠে রাখিল। আমাদের দুই তিনটা গাঁঠরি এবং সাহেবের যন্ত্রাদি ও বন্দুক জলবেগে ছিন্নবন্ধন হইয়া সমুদ্রজলে পরিভ্রষ্ট হইল।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রের আকার দেখিয়া সহানুভূতিতে আকাশও এই সময়ে ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল।

পূর্ব্বদিন অবধি আকাশে মেঘ সঞ্চয় দেখিয়া আসিতে ছিলাম; আজি সমুদ্রসমুত্থ বাষ্পরাশি মেঘরূপে চারিদিক আবৃত করিল। অকস্মাৎ বায়ু নিশ্চল ও চতুর্দ্দিক স্থিরভাব ধারণ করিল। ঝড় উপস্থিত হইবার বিলম্ব নাই বুঝিলাম। বিপদের উপর বিপদ!

এইরূপে প্রায় একঘণ্টা অতীত হইল: তখনও রণমত্ত জন্তুগণ সমুদ্রবারি মথিত করিতে ছিল। এতক্ষণে প্রকৃতির ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। প্রথম বাত্যার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধনিরত জন্তুরা জলে ডুবিল। প্রবল বায়ুবশে আমাদের নৌকা অতি দ্রুতবেগে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে দৌড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম সমুদ্র জল ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সাহেব বলিলেন, দুই রাক্ষসের মধ্যে একটা অবশ্যই মরিয়াছে, তাহারই রক্তে জল লোহিত হইয়াছে।

ক্রমেই ঝড়ের বৃদ্ধি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের বৃদ্ধি। সাহেব একজন

অত্যুৎকৃষ্ট কর্ণধার। তাঁহারই কৌশলে এখনও নৌকা পর্য্যস্ত হয় নাই। আমি পাইল নামাইতে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"না, পাইলভরে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগে চলিয়া গেলে আমরা শীঘ্রই ইহার সীমার বাহিরে পড়িব। সমস্ত সমুদ্র ব্যাপিয়া ঝড় হয় না। হয়ত আমরা তীরেও উপস্থিত হইতে পারি।"

আমাদের সম্মুখে রাশি রাশি বাষ্প বায়ুবেগে উড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন, তথাপি আলোকের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু কোন দিকে কিছু দেখিবার উপায় নাই। যখন উপরে উঠিতেছি, দেখি—নিবিড় বাষ্পরাশি চারিদিক আবৃত করিয়া রহিয়াছে; যখন নীচে নামি—ভীষণাকৃতি অত্যুচ্চ জলময় ভিত্তি আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেবীপ্রসাদ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"আমি অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি। আশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় বৈতরিণী শুভসন্তরণকামনায় কৃষ্ণগাভী দান করিয়া আসি নাই। যদিও পুণ্যবলে, ধর্ম্মসহায়ে উড়ুপে এই সাগরসদৃশ নদী পার হইব, তথাপি কর্ত্তব্য কার্য্যের অননুষ্ঠান বশতঃ ক্লেশভোগ হইতেছে।"

সমুদ্রের তরঙ্গমালা আমাদিগকে এক একবার তিন চারি শত হস্ত উপরে তুলিতেছে, আবার গভীর জলময় গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। একবার এইরূপে উপরে উঠিয়া দেখি, প্রায় চারিশত হাত উচ্চ জলরাশি আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—আমাদের উপর পড়িল, পড়িল—গেলাম—উত্তুঙ্গ জলরাশি আসিয়া আমাদিগকে একবারে গর্ত্তসাৎ করিল।

জলের ভিতরেও মাস্তুল ধরিয়া আছি। অতি প্রবল জলস্রোতঃ আমাকে ভেলাচ্যুত করিবার জন্য টানিতেছে। প্রাণপণে চতুর্গুণ বলে মাস্তুলে লগ্ন হইয়া রহিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে তরঙ্গ আবার আমাদিগকে জলের উপব তুলিল। উপরে উঠিবামাত্র আমাদের অবলম্বনভূত মাস্তুল বায়ুবেগে ভাঙ্গিয়া জলে পড়িল। আমি অমনি ভেলার কাষ্ঠ ধরিয়া শয়ান হইয়া পড়িলাম। রাজা আমার কটিদেশ হস্তে বেষ্টন করিয়া ভেলার উপর পড়িলেন। নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে আবার জলমগ্ন হইলাম। যে অবস্থায় ডুবিলাম, জলের নীচেও সেই অবস্থায়। সেই এক মুহূর্ত্ত মধ্যে শতবার শরীর ভাসিয়া যাইবার উপ-

ক্রম করিল। আমার ও রাজার উভয় দেহ আমাকে টানিতেছে; অবশ্যই স্তে ভেলা ছাড়িতেছি, আবার উপরে উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, আমাদের সমস্ত দ্রব্য সাহেবের সহিত ভেলার উপর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমি রাজাকে কোমর ছাড়িয়া ভেলার কাষ্ঠ ধরিতে বলিলাম। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখনই আবার ডুবিলাম; অমনি মনে হইল, বুঝি রাজাকেও হারাইতে হয়। উপরে উঠিয়া দেখি, তিনিও আমার ন্যায় ভেলার কাষ্ঠ ধরিয়া পড়িয়া আছেন। তাহার প্রায় দশ মিনিট পরে আবার জলগর্ভস্থ হইলাম। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; আমার অবস্থা দেখিয়া দেবীপ্রসাদ আমাকে ধরিয়া রহিলেন—আবার ডুবিলাম—এবার জলমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারাইলাম।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন চৈতন্যের সাহায্যে চক্ষু চাহিলাম--তখন আমি সাগরের কূলে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদমূলে পাষাণশয্যায় শয়ান আছি। কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখি, সমুদ্র প্রশান্তমূর্ত্তি ধরিয়াছে। সে ভীষণ তরঙ্গমালা, সে কর্ণবধিরকর ঘোর গর্জ্জন, সে প্রচণ্ড ভীমনাদী বায়ু কিছুই নাই। প্রকৃতি আপনার ক্ষমতা দেখাইয়া এখন মানুষের ন্যায় হাসিতেছে। অল্পদূরে জলের প্রান্তভাগে ভেলার ভগ্নাবশেষ কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ তীরভূমিতে আঘাত করিতেছে! রাজার কোন চিহ্ন নাই।—তখন আপনার অবস্থা ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার—তাহার পর কি করিলাম, জানি না। শেষে যখন বোধশক্তি পুনরাগত হইল, তখন দেখি, আমার দয়াময় প্রভু দেবীপ্রসাদের ক্রোড়ে মস্তক দিয়া শুইয়া আছি। রাজাকে পুনর্ব্বার দেখিয়া অশ্রুজল সহস্র ধারায় আমার মুখ বহিয়া পড়িতে লাগিল।

চিত্তের আবেগ একটু উপশম হইলে জানিলাম, আমি প্রায় দশ প্রহর

অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। তাহার পর এখানে ভেলা পর্ব্বতাহত হইয়া চূর্ণ হইল। আমার প্রভু সে সময়ে আমাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্তে রক্ষা করেন। তাহার অনেকক্ষণ পরে আমাকে রাখিয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে কোন প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য পাওয়া যায় কি না, দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, এমন সময়ে আমার নিরাশ্বাস চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। বেগে আসিয়া দেখেন, আমি মোহে অচেতন। সেই অবধি কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।

অনেক ক্ষণের পর আমি সাহেবের কথা জিজ্ঞাসিলাম। রাজা বলিলেন—ধর্ম্ম অন্তর্ধান হইয়াছেন। অনতিবিলম্বে আমরা ত্রিদিবে স্বমূর্ত্তিতে তাঁহার দর্শন লাভ করিব। নিকটেই স্বর্গের সোপান। আমি এই মাত্র সোপান দেখিয়া আসিতেছি।

জর্ম্মানের জীবনের তাদৃশ পরিণাম ভাবিয়া আমি অশ্রুত্যাগ করিলাম। রাজা বলিলেন, সমস্ত পর্ব্বতে আহারীয় অন্বেষিলাম, কিছুই মিলিল না। শেষে ভেকছত্রের মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম; তোমার জন্যও আনিয়াছি, আহার কর। আমাদের ক্লেশ অবসানপ্রায় হইয়াছে।

আহারান্তে শরীর একটু সুস্থ হইল। আমি তাঁহার সহিত স্বর্গের সোপান দেখিতে চলিলাম। প্রায় দশ মিনিটের পর আমরা এক প্রস্তরময় গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গৃহের দ্বার পূর্ব্বদিকে। পশ্চিমদিকে প্রশস্ত গুহামুখ মনুষ্যের অস্ত্রভিন্ন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইল। গৃহের ভিত্তিতে অসংখ্য কুলুঙ্গী এখানে পূর্ব্বকালে মনুষ্যাবাসের পরিচয় দিল। বিস্ময় ও চিন্তাপূর্ণমনে গৃহের বাহিরে আসিতেছি, দেখি—দ্বারের নিকট মেঝের উপর লেখা রহিয়াছে—

বর্ষান্ পরঃশতাংস্তপ্ত্বা তপো বুদ্ধঃ সমাহিতঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাল্লেভে জ্ঞানং নির্ব্বাণকারণম্॥
কলের্বর্ষশতে যাতে বোধিসত্ত্বো গুহাং জহৌ।
ব্যাসকল্পিতমার্গেণাধ্যারুরোহ পুনর্ভবম্॥

অলৌকিক স্বপ্নাতীত ঘটনা সকল দর্শনে আমি সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। নিকটস্থ গুহামুখ দিয়া উপরে উঠিতে পারা যাইবে বুঝিলাম। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া শ্লোক দুটি বিলক্ষণ কণ্ঠস্থ করিয়া লইলাম। মনে হইল, যদি কখন পৃথিবীর উপরিভাগদর্শন অদৃষ্টে থাকে—শ্লোকদুটি মোক্ষমূলর ভট্টাচার্য্য বা রাজেন্দ্র লাল শর্ম্মাকে উপহার দিব। তাঁহারা এই দুই শ্লোকের সাহায্যে অনায়াসে দুই ডজন গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতে পারিবেন।

রাজা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিচরণ, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নয়। চল, আমরা শুভ স্বর্গযাত্রা করি। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ীর সংখ্যা এক লক্ষ। পথে ক্ষুধাকাতর ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। আমি আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি। তুমি বিশ্রাম কর।

ব্যাসের কথাবলে বলীয়ান্ হইয়া আমি সোৎসাহে রাজার সহিত গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। গুহা সেতুর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পথের ন্যায় ঢালু হইয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। চলিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। ক্রমে অন্ধকারের অধিকারমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অন্ধকারে চক্ষু একরূপ অভ্যস্ত করিবার মানসে ৫। ৬ ঘণ্টার পর বিশ্রামের প্রস্তাব করিলাম। রাজাও সম্মতি দিলেন। ভেকের ছাতায় উদর পূর্ণ করিয়া শয়ন করিলাম।

এইরূপে তিন দিন অতীত হইল। চতুর্থ দিবসে আমাদের আহারীয় ফুরাইল। আবার সেই ক্ষুধা, সেই তৃষ্ণা—সেই ক্লান্তি। সেই অন্ধকারময় গুহা। সাহেবও সঙ্গে নাই—তাঁহার অস্ত্র শস্ত্রও নাই। কল্পনায় সেই ক্লেশ অনুভূত হইতে লাগিল। রাজাকে বলিলাম;—তিনি বলিলেন—"আর চিন্তা নাই। চিরসুখের আগার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।" সংসারে দেবী প্রসাদের ন্যায় লোকেই যথার্থ সুখী।

শুষ্ককণ্ঠে, দুর্ব্বলদেহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টার পর পদক্ষেপে জানিলাম পাষাণ নির্ম্মিত অসমান সোপানশ্রেণী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। রাজা হর্ষে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"দেবরাজের জয়; ধর্ম্মের জয়। হরিচরণ, আর ভয় নাই, আমরা স্বর্গের সিঁড়ী পাইয়াছি।"

আমারও মনে আশা জন্মিল; দেহে নূতন বল আসিল। মনে

করিলাম, অনতিবিলম্বে একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইব। আমরা সাহস ও উৎসাহে ত্বরিতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

প্রায় চারি ঘণ্টার পর সোপানশ্রেণী অন্তর্হিত হইল। দুই বা আড়াই হস্ত উচ্চ একটি সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া সোপানমালা তিরোহিত হইয়াছে। আমরা অনেক ভাবিয়া অগত্যা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। অর্দ্ধশয়ান-ভাবে কষ্টে প্রায় দুই শত হাত আসিলে সুড়ঙ্গের শেষ হইল। উঠিয়া দাড়াই-লাম। রাজা বলিলেন, হরিচরণ, বোধ হইতেছে, ক্লেশের অবসান হইল। আমরা স্বর্গের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া দেবতাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আর অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই; অগ্রসর হওয়া যাউক।

আমি নীরবে অগ্রসর হইলাম। পথে প্রস্তরময় স্তম্ভ ছিল। একটু আসিয়া তাহাতে আহত হইলাম। শরীর অবশপ্রায় হইয়াছিল; পড়িয়া গেলাম। নীচেও পাষাণখণ্ড উচ্চ হইয়াছিল, মাথায় লাগিল, সর্ব্বশরীর বজ্রাহত হইল, তাহার সহিত চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল।

কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না, চক্ষু চাহিয়া দেখি, আমি এক সঙ্কীর্ণ গহ্বরের ভিতর শয়ান রহিয়াছি। রাজা ও আর একটি লোক পার্শ্বে উপবিষ্ট। উপরে নীল নভোমণ্ডলে দুই চারিটি নক্ষত্র উজ্জ্বলালোকে ম্লান হইতেছিল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম, আমারা কোথায় আসিয়াছি।

রাজা উত্তর করিলেন না। অপর ব্যক্তি বলিল "প্রয়াগে পাতাল পুরীতে।"

দুর্গমধ্যস্থ পাতাল পুরীর মধ্যে একটি অনতিপ্রশস্ত সুড়ঙ্গাকৃতি পথ আছে, জানিতাম। পাণ্ডারা বলে ঐ পথে গয়াক্ষেত্রে যাওয়া যায়। আজি সেই পথে এখানে আসিয়া আমাদের ভূগর্ভভ্রমণের অবসান হইল; রাজার সশরীরে স্বর্গযাত্রার শেষ হইল।

দেবীপ্রসাদ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া মৌনাবলম্বনে বসিয়া ছিলেন। অনেক ক্ষণের পর বলিলেন—আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। দেবতারা আমার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন। এখন বুঝিতেছি, যবনসংসর্গই আমার ব্যর্থমনোরথ হইবার একমাত্র কারণ!

সেই স্থানে পাণ্ডার নিকট শুষ্ক পেঁড়া ও গঙ্গাজল লইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার বেগ শান্ত করিলাম।

ক্রমে সূর্য্যের মনোমোহন আলোক আকাশে দেখা দিল। আমি আপনার অদৃষ্টচিন্তায় ব্যাপৃত হইলাম। রাজার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথাও ভাবিলাম। তিনি এতকাল ঐশ্বর্য্যভোগে কাটাইয়া এখন নিতান্ত দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার নিকট দুই তিন সহস্র মাত্র টাকা আছে। তাহাতে তাঁহার মনোমত স্বচ্ছন্দে অবস্থান অসম্ভব। তিনি আপনার বুদ্ধিতে রাজ্য হারাইয়াছেন; এখন সমস্ত ধন হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন। দাঁড়াইবার একটু স্থানও নাই।

রাজার উইলে লেখা ছিল, একবৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে দানীয় ব্যক্তিরা অর্থসম্পত্তির অধিকার পাইবেন। এক বৎসর কি অতীত হইয়াছে?—পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তারিখ স্থির হইল না। চতুর্গুণ মূল্যে তাহার পুরাতন বস্ত্র কিনিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। পাতাল পুরী ত্যাগ করিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন—হরিচরণ, দুরদৃষ্টবশে সকল দিক্ হারাইলাম, এখন কোথায় যাই?

কোকিলভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব রাজ্যেশ্বরের নিরাশ্বাসবাক্যে হৃদয় ব্যথিত হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বাঙ্গালী বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম। পাঁচ বার অগ্রসর ও পাঁচ বার পশ্চাৎপদ হইয়া শেষে সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে তারিখ জিজ্ঞাসা করিলাম। বাবু বলিলেন, "১২ ই সেপ্টেম্বর।"

১৩ ই সেপ্টেম্বর রাজা দেবীপ্রসাদ উইল সাক্ষর করেন। আজি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বৎসর পূর্ণ হইবে; এখনও সময় আছে। দিবসের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইতে পারিলেই রক্ষা হয়। রাজাকে সকল কথা বলিলাম—তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে দুর্গের বাহিরে আসিলাম। গাড়ী মিলিল না। পদব্রজে রেলওয়ে ষ্টেশনে চলিলাম। রাজা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ছিলেন বলিয়া আমাদের দ্রুতধাবনের নিতান্ত ব্যাঘাত ঘটিল। শেষে একখানি একা পাইলাম। অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল; কিন্তু আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। একা ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিল, রেলওয়ের গাড়ীও ঠিক সেই সময়ে সাঁ সাঁ শব্দে চলিয়া গেল।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ষ্টেশনে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশীতে আর গাড়ী যাইবে না। আমি ষ্টেশনমাষ্টার সাহেবকে স্পেশিয়াল ট্রেনের জন্য অনুরোধ করিলাম। ষ্টেশনে অনেকগুলি কল ছিল। সাহেব মনে করিলে আমাদিগকে তখনই গাড়ী দিতে পারিতেন;—কিন্তু তিনি আমাদের ব্যগ্রতা বুঝিলেন না—বলিলেন " সাড়ে এগারটার সময় গাড়ী পাইবে।"

বেলা প্রায় আটটার সময়ে আশ্রমের প্রধান পূজারীকে হিন্দীতে টেলিগ্রাফ্ করিলাম—"আমরা বেলা দুই প্রহরের সময় স্পেশিয়াল ট্রেনে কাশীযাত্রা করিব। তুমি যথা সময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাহেবকে জানাইবে।"

বেলা প্রায় তিনটার সময় কাশীর ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী আসিল। বাহিরে আসিবামাত্র দুই জন মাঝি আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া পরপারে লইতে যাইতে চাহিল। তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া রামহটলের প্রেরিত চর বলিয়া প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল। রাজাকে বলিলাম; তিনি বলিলেন " কাশীতে আর তাহার চালাকি খাটিবে না। আর সে কাশীতে আসিয়াছে কি না তাহারই বা নিশ্চয় কি।"

মাঝিরা একরূপ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে নৌকায় লইয়া চলিল। সিকরোলে সত্বর পঁহুছিয়া দিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিব—স্বীকার করিয়া আমরা তাহাদের নৌকায় উঠিলাম।

মাঝিরা নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে লইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে একখানি ক্ষুদ্রনৌকা দক্ষিণ দিক্ হইতে আমাদের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন ব্রাহ্মণ নৌকার উপর দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমাদের নৌকায় আসিয়া বলিল—আশ্রমের প্রধান পূজক তাহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি দুই প্রহরের সময় আদালতে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিয়াছেন। এখন আর আমাদের কাছারী

যাইতে হইবে না ; পূজক আপনাদিগকে আশ্রমে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি বলিলাম—তিনি স্বয়ং আসিলেন না কেন?

উত্তর। তিনি কয়েক দিন অবধি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন। পীড়িত শরীরে কাছারিতে আসিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

আমি। ভাল, তুমি আশ্রমে ফিরিয়া যাও। আমরা একবার কাছারি গিয়া তাহার পর আশ্রমে যাইতেছি।

ব্রাহ্মণ আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। মাঝিরাও উজান বাহিয়া চলিল; আমি বলিলাম, মাঝি, কোথায় যাইতেছ ?

ব্রাহ্মণ। আশ্রমে।

আমি আবার একটু উচ্চস্বরে বলিলাম—মাঝি কোথায় যাও ?

মাঝি। ব্রাহ্মণমহারাজ আমাদিগকে এই দিকে যাইতে বলিতেছেন।

ঠিক এই সময়ে ব্রাহ্মণ স্বীয় নৌকা ত্যাগ করিয়া আমাদের নৌকায় আসিল। আমি সহসা তাহার নিকটে গিয়া পা ধরিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলাম। নৌকার মাঝিকেও অমনি জলে ফেলিয়া স্বহস্তে কর্ণ গ্রহণ করিলাম। দ্বিতীয় নৌকার একজন মাঝি ঠিক সময়ে লাফাইয়া আমাদের নৌকায় পড়িল। রাজা তাহার মস্তকে যষ্টিপ্রহার করিলেন। তাহার বস্ত্র মধ্যে তরবারি ছিল, পড়িয়া গেল; আমি লইতে যাইতেছি, আমাদের নৌকার এক মাঝি রাজার স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিল। আমি অমনি তরবারির আঘাতে আততায়ীর দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিলাম। জলে পতিত ব্রাহ্মণ এই সময়ে আসিয়া নৌকা ধরিল—আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম—ছাড়িয়া দাও, নতুবা মস্তক ছেদন করিব। ব্রাহ্মণ নৌকা ছাড়িয়া সন্তরণে নদী পার হইয়া চলিল। আমাদের জলপতিত মাঝিও প্রাণভয়ে তাহার অনুগামী হইল।

একখানি পারগামী নৌকা বেগে আমাদের দিকে আসিতে ছিল। আমি দুই তিন বার কর্ণ সঞ্চালন করিয়া তাহাদের নিকটবর্তী হইলাম। তাহাদের সহায়তায় আমরা দস্যুহস্তে রক্ষা পাইলাম। ক্ষুদ্র নৌকার মাঝিগণ বেগে রামনগরের দিকে চলিয়া গেল।

আমাদের নৌচালকগণ এখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্ত হইয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে অভয় দিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিতে বলিলেন। তাহারা যাহা বলিল, তাহাতে আমার পূর্ব্ব সন্দেহ সম্পূর্ণ সমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বুঝিলাম—পাপাত্মা রামটহলই এই সমস্ত অনর্থের মূল।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব গাড়ীতে উঠিতেছেন, আমরাও কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। রাজার রক্তাক্ত শরীর, আমার ব্যগ্রভাব ও দর্শনার্থী লোকদিগের জনতা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। আমি সংক্ষেপে তাঁহাকে আমাদের প্রার্থনা জানাইলাম। সাহেব পুনর্ব্বার বিচারালয়ে গিয়া বসিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মোকদ্দমার শেষ হইয়া গেল। রামটহলের ধরিবার আদেশ বাহির হইল। প্রহরীরা মাঝিদিগকে ধরিবার জন্য ছুটিল। আমরাও কাছারি ত্যাগ করিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলাম। আশা করিয়াছিলাম, ধ্বজাধারী ও মনিয়াকে আশ্রমে দেখিতে পাইব। হয়ত—আমার যোগমায়ারও সাক্ষাৎ মিলিবে। আশা বিফল হইল, তাঁহারা কাশীতে আসেন নাই। রামটহল গা-ঢাকা দিয়াছিল। পুলিষের লোকেরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

কাশীর এক ডাক্তার পিতার বন্ধু ছিলেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথমে কাশীতে আসি, তখন তাঁহার সহিত দুই একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। রাজার উইলে আমার নামস্বাক্ষর ছিল। শেষ দিনে আমার স্বাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই মাজিষ্ট্রেট উইল রদ করেন। কাশীতে এই ব্যাপার লইয়া মহাগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু নাম শুনিয়া আমার অনুসন্ধানে আশ্রমে আসিলেন। প্রথমেই আমার সহিত সাক্ষাৎ। কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমারই নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ?

আমি তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম; আমার নাম করাতে অভিপ্রায়ও বুঝিলাম। সহসা উত্তর দিতে পারিলাম না। ডাক্তার বাবু আবার বলিলেন, "তোমারই নাম হরিচরণ ?"

আমি। হাঁ।

ডাক্তার। তুমি যে এই একবৎসরে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী হইয়াছ। আকারেরও

অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; চিনিতে পারা যায় না। তোমাদের রাজা কোথায়? চল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

ডাক্তার বাবু আমার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহার ত্রিকোণ গৃহে পুথি লইয়া বসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম আমাদের ভূগর্ভভ্রমণ সম্বন্ধে দুই চারি কথার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন, হরিচরণ, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি, তোমার জ্ঞানের, শেষ এই পরিণাম হইল? শেষে বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। তোমার প্রসূতিও মৃত্যুশয্যায়। বাটীর সকলেই ম্রিয়মাণ; সকলেই মৃতপ্রায়। তোমার দাদা সমস্ত পশ্চিম দেশ ভ্রমণ করিয়া অল্প দিন হইল দেশে গিয়াছেন, তাঁহার শোকমলিন মুখ দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। তোমাদের শত্রুরা সময় পাইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেছে। কেবল তোমার জন্য সমস্ত সংসার ছারখার হইল।

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া মন নিতান্ত ব্যথিত হইল। পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যুশয্যা, দাদার ক্লেশ শুনিয়া চক্ষুজলে প্রবাহ বহিল।—আমার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, যদি মৃত্যুকালে জননীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, অবিলম্বে দেশে যাত্রা কর। চল, আমি সঙ্গে করিয়া তোমাকে ঘরে রাখিয়া আসিতেছি। তুমি বালক নও, লেখা পড়াও শিখিয়াছ; পিতৃমাতৃহত্যার ভয় কর না?

আমি উত্তর করিতে পারিলাম না। অধোমুখে, নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

ডাক্তার। চল অদ্য রাত্রিতেই আমরা যাত্রা করি। রাজার উইল রদ হইয়াছে; অপরাধীদের বিচারের এখনও বিলম্ব আছে। এখন যদি প্রসূতির প্রতি দয়া হয়, তাঁহার জীবন রক্ষা করা আবশ্যক মনে হয়, চল, অদ্যই যাত্রা করি।

ডাক্তার বাবু যতদূর জানিতেন, রাজাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। দেবীপ্রসাদ শুনিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, হরিচরণ, যাও বৎস, দেখা দিয়া জননীর

জীবন রক্ষা কর। পরিবারদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে মাতাকে সঙ্গে লইয়া আইস। তোমার প্রসূতির প্রাণ রক্ষার জন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। যাও—তাঁহাকে গিয়া দর্শন দাও। কিন্তু দেশে অধিক কাল থাকিও না; অবিলম্বে তোমাকে যেন দেখিতে পাই। বিধাতার বিড়ম্বনায় আমাকে আবার আশ্রমবাসী হইতে হইল। এখন তুমিই আমার একমাত্র আত্মীয়, আমার পুত্রস্থানীয়। তারা আমাকে ফাঁকি দিল; দেখিও, তুমিও যেন আমাকে বঞ্চিত করিও না।

সন্ন্যাসীর চিত্তের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি কাঁদিলাম; কিন্তু কথা কহিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধনে আমার সামর্থ্য হইল না।

রাজার নিকট বিদায় হইয়া আসিবার সময় ডাক্তার বাবু বলিলেন, হরিচরণ, আমি দেখিতেছি, ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত যুবকেরা নিঃসম্পর্কীয় লোকের দুঃখে বিলক্ষণ কাঁদিতে পারে।

রাত্রির গাড়ীতে কাশীত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলাম। ডাক্তার বাবুকে নিষেধ করিলেও তিনি সঙ্গী হইলেন। সমস্ত পথ অনুতাপ, শোক, দুঃখ, ভয় ও লজ্জার অসহ্য পীড়ন সহ্য করিয়া দেশে আসিলাম। চতুর্দ্দিক আমার চক্ষে বিষময়; পরিচিত সমস্ত বস্তু, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, আমার চক্ষুঃশূল হইল। হৃদয়ের ব্যথায় অস্থির হইয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলাম। দূরে আমাদের বাটী দেখিয়া আর পা চলিল না। ডাক্তার বাবু এতক্ষণ স্তোভ দিয়া করাবলম্বনে আমাকে আনিতেছিলেন; তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। চারিদিক অন্ধকারময় দেখিয়া আমি পথিমধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। চন্দ্রালোকে নিকটেই আমাদের বাটী দেখা গেল, মনে করিলাম, কেহ না কেহ বাহির হইয়া আসিবে। কেহই বাহিরে আসিল না। বাটী নীরব, নিঃশব্দ; আর আমার চক্ষে যেন ভীষণ অগ্নিময়। অনেক ক্ষণের পর ডাক্তার বাবুর যত্নে বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। একজন ভৃত্য উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, ভিতরে যাইতে প্রতিপদে বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়ের সকল ধমনী নাচাইয়া রুধিরস্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অন্তঃপুরে নিদ্রাশূন্যা জননীর

ক্ষীণ রোদনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন একান্ত কাতর হইয়া রোদন করিয়া উঠিলাম।

ভৃত্যেরা গিয়া মাতাকে সংবাদ দিয়াছিল। আমার রোদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ক্ষীণস্বরে উচ্চ রোদনধ্বনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আকাশে উঠিল। আমি বেগে গিয়া শয্যালগ্না, পতিপুত্রাভাবে শুষ্কশরীরা জননীর উৎসঙ্গে আশ্রয় লইলাম। মা চেতনা হারাইলেন। আমিও একরূপ জ্ঞানহীনের ন্যায় তাঁহার গললগ্ন হইয়া রহিলাম।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যতদিন যোগমায়া আমাদের গৃহবাসিনী, সমীপবর্ত্তিনী ছিল, ততদিন তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করি নাই; দুইটা ভাল কথাও বলি নাই। এখন তাহাকে হিমালয়ে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম। এখন, আমাদের যোগমায়াবিহীন ভবন শূন্য—অন্ধকারময় বোধ হইল। আমার মুখে তাহার সাহস, তাহার কার্য্যকলাপ আর তাহার সেই কোমল দেহের, সেই মধুর হৃদয়ের তাদৃশ পরিণাম শুনিয়া সকলেই রোদনের কোলাহল তুলিল। মা শোকে একবারে অধীর হইলেন।

আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। যোগমায়ার পুনর্দ্দর্শন পাওয়া যাইতে পারে—তাহাও বলিলাম। মা বলিলেন, বাবা, তুমি গৃহলক্ষ্মী পদদলিত করিয়া বিদায় করিলে। যে দিন সাক্ষাৎলক্ষ্মী স্বর্ণপ্রতিমা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সেই দিন অবধিই বিপদের উপর বিপদ; সংসার ছারখার হইল।

মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

দাদা তখনও আমার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমিতেছিলেন। চারিদিন পরে তিনি বাটী আসিয়া আমাকে দেখিলেন। তাহার দুই দিন পরে ডাক্তার বাবু আমাদের বিদায় ও জননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন।

প্রায় পনর দিন পরে রাজা দেবীপ্রসাদের পত্র পাইলাম। পত্রখানি এই—

"বৎস হরিচরণ,

তুমি দেশে গিয়া আমাকে ভুলিয়াছ; যাইবার সময় যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছ। ডাক্তার বাবুর মুখে শুনিলাম, তুমি দেশে গিয়া নিতান্ত শোককাতর হইয়াছ। অতীত বিষয়ের জন্য শোক করা অনর্থক। তাহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। তোমার পিতা আর ফিরিয়া আসিবেন না। লাভের মধ্যে কেবল আপনার শরীর নষ্ট হইবে।

বৎস! তারা পরমবন্ধু ধ্বজাধারীর সাহায্যে রামটহলের হস্তে নিস্তার পাইয়া কল্য আশ্রমে আসিয়াছে। এখন সকলেই তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তুমি এখানে আসিলে সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইবে।

তোমার শোকাতুরা জননীকে সঙ্গে করিয়া আনিবে; কাশীবাসে তাঁহার শোক নিবারণ হইতে পারিবে।"

ইহার সাত দিন পরে আমি মাতাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে আশ্রমের পাঁচ ছয় জন লোক আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগজীবন ফিরিয়া আসিয়াছেন?"

উত্তর। আসেন নাই। রাজার কন্যা ও ধ্বজাধারী নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

কাশীতে রাজার অনেকগুলি বাটী ছিল। মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী তাঁহার একটি বাটী মাতার বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভৃত্যেরা আমাদিগকে সেই বাটীতে লইয়া গেল। তাহার আধ ঘণ্টা পরে আমি সকলকে সেই স্থানে রাখিয়া একাকী আশ্রম যাত্রা করিলাম।

আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই ধ্বজাধারীর সাক্ষাৎ পাইলাম। প্রাচীন সন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়াই দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। আমার হাত ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে মনের ভাব সম্বরণ করিয়া অন্যান্য নানা কথা উত্থাপন করিলেন; আমার জননীর কথা জিজ্ঞাসিলেন; শেষে আমাদের ভূগর্ভভ্রমণের কথা উঠিল। আমি অন্যমনে নীরবে

বসিয়া রহিলাম। যোগমায়ার কথা জিজ্ঞাসিতে সাহস হইল না। কিন্তু কিছু পরে রাজার অনুরোধে মনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিয়া গেলাম।

অপরাহ্নে আশ্রমের প্রধান পুরুষেরা মনিয়াকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে আমাদের বাসায় আসিলেন। মা স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—কই আমার যোগমায়া কোথায়—

ধ্বজা। যোগমায়াকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না।

মা শুনিবামাত্র বিকট চীৎকার করিয়া গৃহমধ্যে গেলেন; মনিয়া রাজার উপদেশে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ধ্বজাধারী বলিলেন, হরিচরণ, তোমরা নদীর জলে পড়িয়া গেলে আমি মনিয়ার সহিত নদীর তীরে তীরে তোমাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। প্রথমেই যোগজীবনের মৃতপ্রায় দেহ দৃষ্ট হইল। অনেক যত্ন করিয়া তুলিলাম; চেষ্টা করিয়া অগ্নি জ্বালিলাম। মনিয়াকে তাহার শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া আপনি তোমাদের অন্বেষণে চলিলাম। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলিলেন, অন্ধকার হইয়া আসিল; তখন তোমাদের পুনর্দ্দশনের আশা ছাড়িয়া যেখানে যোগজীবনের পার্শ্বে মনিয়াকে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেই দিকে ফিরিলাম। সমস্ত রাত্রি নদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধান পাইলাম না। পর দিন সায়ংকালে এক ধীবরের মুখে শুনিলাম, চারি পাঁচ জন মহান্ত দুইটি স্ত্রীলোককে ধরিয়া বেহুয়া গ্রামের দেবমন্দিরে লইয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া দেবমন্দিরে আসিলাম। মন্দিরের দ্বার চাবি দিয়া বদ্ধ রহিয়াছে। চাবি ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে দীপ জ্বলিতেছে। মনিয়া যোগজীবনের মৃতদেহের নিকট বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই মনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, এইমাত্র যোগজীবন প্রাণত্যাগ করিল; রামটহলই তাহাকে বধ করিল। তাহারা আমাকেও কোথায় লইয়া যাইবার জন্য চৌদোলা আনিতে গিয়াছে।

আমি ও মনিয়া যোগজীবনের অচিরমৃত দেহ লইয়া রাত্রির অন্ধকারে বাহির হইলাম। অনেক দূরে গ্রামান্তরে গিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন

করিলাম। সেই সময়ে রামটহল ও তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সহসা দলে বলে আসিয়া মনিয়াকে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আমি গ্রামের লোকদিগকে পশ্চাদ্ধাবনে অনুরোধ করিলাম। তাহারা অস্ত্র লইয়া দস্যুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। শ্বাপদস্বভাব দস্যুরা শেষে মনিয়াকে এক গহ্বরে ফেলিয়া পলায়ন করিল।

ভাগ্যক্রমে মনিয়ার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। যমুনোত্রির আশ্রমে থাকিয়া চারি মাস চিকিৎসার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। তাহার পর কাশী আসিতে সংকল্প করিয়া বাহির হইলাম—মনে করিলাম কাশীতে রাজার যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহার অধিকার মনিয়াকে দেওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইব। কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত মঠ ত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম। পথে সাহারণপুরে রামটহলের চক্রে স্ত্রীচোর বলিয়া পুলিষের লোকেরা আমাদিগকে বন্দী করিল। প্রায় এক মাসের পর মুক্তি পাইয়া কাশীতে আসিলাম। রাজা তাঁহার কন্যা পাইলেন, মনিয়াও তাহার পিতাকে পাইল; কিন্তু যোগজীবনকে আনিয়া তোমার হস্তে দিতে পারিলাম না, এই দুঃখ রহিল।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে আমার চিরনির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে মনিয়া ও আমি বসিয়া আছি। নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। আমি বলিলাম, মনিয়া, তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ আছে—রক্ষা করিবে?

মনিয়া। বল, শুনি।

আমি। রাজা অজয়নগরের রাজকুমারের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। তোমার নিতান্ত অসম্মতি দেখিয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আমার অনুরোধ, পিতার মনে আর দুঃখ দিও না; রাজকুমারের পত্নী হইবে, স্বীকার কর।

মনিয়া। পিতা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয়েন। তিনি আমাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা শুনিয়াই অজয় নগরের লোকদিগকে বিদায় করিয়াছেন। তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং অন্য লোকে আপত্তি করিয়াছিল। পিতা সে আপত্তিও শুনেন নাই। তিনি বলেন, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণে কন্যা দান করিতে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। শুনিয়াছি, তোমার মাতারও মত হইয়াছে।

আমি। মনিয়া, আর সকলের মত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার নিজের আপত্তি আছে। আমি বিবাহ করিব না।

মনিয়া। তুমি পূর্ব্বে বিবাহ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। এখন অসম্মত হইতেছ কেন?

আমি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, যোগমায়ার প্রাণবধের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহার অতুলপবিত্রপ্রণয়ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

মনিয়া। যোগমায়া মরিবার পূর্ব্বে বিবাহের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। আমার হস্তে তোমার রক্ষার ভার, দেখিবার ভার, দিয়া গিয়াছেন।

আমি। মনিয়া, ক্ষান্ত হও। মহাপাতকীর সহিত আর কথা কহিও না। বিবাহ করিয়া আর আমি সংসারের অমূল্য রত্ন স্ত্রীজাতির অপমান করিব না।

মনিয়া। তুমি আর আমাকে ভাল বাসিবে না?

আমি। মনিয়া, তুমি আমার ভগিনী; রাজা আমার পিতৃস্থানীয়। স্বামী স্ত্রীকে যেরূপ ভাল বাসে, আমি তোমাকে সেরূপ ভাল বাসিব না; সহোদর সহোদরাকে যেরূপ স্নেহ করে, সেইরূপ স্নেহ করিব।

মনিয়া ক্ষুন্ন হইয়া উঠিয়া গেল।

আবার মনিয়ার বিবাহসম্বন্ধের কথা আরম্ভ হইল। নানা কথার পর বিজয়পুরের এক রাজকুমারের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে মনিয়া আমার গৃহে আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিল। মনিয়া গৃহে আসিয়া দীপ জ্বালিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসিলাম। মনিয়া বলিল, আমার বিবাহ যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করিতে পার?

আমি। কিরূপে উপায় করিব।—রাজা তোমাকে পাইয়া গৃহী হইয়াছেন—

মনিয়া। পুরুষ ইচ্ছামত কাজ করে। স্ত্রীলোকে পারে না কেন? আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, মনে আছে?

আমি। মনিয়া, ভগিনি, আমি তোমার নিকট অপরাধী। মনে করিয়াছিলাম—তুমি আর সে সব কথা মনে করিবে না।

মনিয়া। জান—এই রাত্রিশেষে তোমার নিকট কি জন্য আসিয়াছি?

আমি। কেন?

মনিয়া। তোমাকে এই কণ্ঠহার দিবার জন্য। যোগমায়া আমাকে এই হার দিয়াছিলেন; তোমার সহিত বিবাহ হইয়া গেলে আমাকে এই হার পরিতে বলিয়াছিলেন। এ হারে আমার আর অধিকার নাই, তাই ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। ইহার পর তুমি যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে এই হার দিও।

মনিয়া আমার শয্যার উপর হার ফেলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিল। বাল্যকালে আমি এই হার পরিতাম; বিবাহের দিন পিতা যোগমায়াকে সমর্পণ করেন। আমি সাশ্রুনয়নে হার দেখিতে লাগিলাম। মনিয়া নীরবে বসিয়া তাহার কবচ ভাঙ্গিতে লাগিল। কবচের ভিতর একখানি কাগজ ছিল। মনিয়া সেখানি পড়িয়া আমার গাত্রে ফেলিয়া দিল। তাহাতে লেখাছিল;—

"মনিয়া রাজা শিবসিংহের কন্যা তারা। যিনি ইহার স্বামী হইবেন, তিনি এই পত্র লইয়া তাহার পিতার নিকট যাইলে কোকিলভঞ্জের সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। কোকিলভঞ্জের পশ্চিমে, সুবর্ণরেখাতীরে অষ্টবটের মূলে আমার পিতার ছয় লক্ষ মোহর ভূমিতে নিহিত আছে। তাহাতেও তাঁহার অধিকার হইবে। শ্রীভবানী দেবী।"

পাঠান্তে বলিলাম, মনিয়া, তুমি বলিয়াছিলে বিবাহের পূর্ব্বে কাহাকেও কবচ দেখাইবে না। এখন যে মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে?

মনিয়া। ইচ্ছা হইল, তাই ভাঙ্গিলাম।

মনিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল। আমি শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কিয়ংক্ষণ পরে আশ্রমের ঘাটে ঘোর আর্ত্তনাদ ও চীৎকারের শব্দ উঠিল।

আশ্রমের লোকেরা দ্রুতপদে গঙ্গাতীরে যাইতে লাগিল। আমিও ত্রস্তভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘাটে আসিলাম। ঘাটের উপর অনেক লোক দাঁড়াইয়া ছিল। জনতার কারণ জিজ্ঞাসিলাম, কেহ কিছু বলিল না। বেগে জনতার ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখি—মনিয়া!

মনিয়া মুদ্রিতনেত্রে, আর্দ্রকেশে, নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম মনিয়া জলমগ্ন হইয়াছিল। ব্যস্তভাবে ডাকিলাম—মনিয়া! মনিয়া!—

ঠিক এই সময়ে ধূলিধূসরিতকেশ ছিন্নকন্থাবৃতদেহ রামটহল কোথা হইতে আসিয়া বেগে জনতার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মনিয়ার মস্তকের নিকট দাঁড়াইল। আমি বিহ্বলভাবে ডাকিলাম—মনিয়া! মনিয়া!—

রামটহল অত্যুচ্চ হাসিয়া, হাত তুলিয়া বলিল, হা! হা! হা! মনিয়া! মনিয়া! হা! হা!

সম্পূর্ণ।

# গ্রন্থকারের দুই একটি কথা।

গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে "ভ্রমিতেছি," "জিজ্ঞাসিলাম," প্রভৃতি কবিতাপ্রচলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে এই প্রকার ক্রিয়াপদ ক্রমে গদ্যে ব্যবহৃত হয়, ইহা অনেকের মতে অভিলষণীয়। তবে যাঁহারা নিতান্ত আপত্তি করিবেন, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে তাঁহারা বৃদ্ধলেখক দিগের ব্যবহৃত "হওয়া" ও "করা" এই দুই ক্রিয়াপদ লইয়া থাকুন, তাহাতে যদি সকলের মন না উঠে, যেন আপত্তি না করেন।

"একঃ কপোতপোতঃ" ইত্যাদি—একটি কপোতবৎস আকাশে উড়িতেছে। অসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষী তাহাকে গিলিবার জন্য দৌড়িতেছে। আকাশে আশ্রয়স্থান নাই। হায় হায়! এখন বিধাতার কৃপা ভিন্ন আর কিছুতেই তাহার রক্ষা নাই।

"পরঃশতানি বর্ষাণি" ইত্যাদি—বৃদ্ধ সংযতচিত্তে শতাধিক বৎসর তপস্যা করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট মোক্ষপ্রদ জ্ঞান লাভ করেন। কলির শতবর্ষ গত হইলে বৃদ্ধ গুহা ত্যাগ করিয়া ব্যাসকল্পিত পথে আবার পৃথিবীর উপর উঠিয়া ছিলেন।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং পিহিতং গুহায়াং" বাক্যটি নিম্ন লিখিত দুই অর্থে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক। গুহার ভিতর গেলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়।

খ। ধর্ম্ম—যুধিষ্ঠির। গুহার ভিতর গেলে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানযাত্রার পরিণাম জানিতে পাওয়া যাইবে।

ব্যারোমেটর—βαρυσ বরু গুরু, μετρν মেত্র মান। বায়ুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব পরিমাপক যন্ত্র। ইহাতে আকাশের অবস্থাপরিবর্ত্তও নির্ণীত হয়।

থারমমেটর—θερμοσ থেরম্ তাপ μετρον মেত্র মান। উষ্ণমান।

ক্রনোমেটর—χρονοσ খ্রন কাল, μετρον মেত্র মান। এক প্রকার উৎকৃষ্ট ঘড়ী।

ম্যানোমেটর—μανοσ মন লঘু, μετρν মেত্র মান। বাষ্পের বলনিয়ামক যন্ত্র।

নগনদী—পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্রনদী। ( Streamlet )